জনকল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুস্তকালয়
২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা।

তিন টাকা



১৯১৯

২৯ বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা থেকে ডি. সি. ব্যানার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা থেকে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শিল্পী শ্রীসুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাঁধাই করেছেন মেসার্স বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

নিবেদন

বিশ্বমানবের দরবারে, মানবতার বিচারসভায় বিজ্ঞান আজ কাঠগড়ার আসামী। ব্যাপক ধ্বংসকার্যের নেতা ও মহামারণ যজ্ঞের হোতা, ইহা ছাড়া জনগণের কাছে বিজ্ঞানের আর অন্য পরিচয় কি আছে? সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সম্মুখে বিজ্ঞান আজ মৃত্যুর করাল বিভীষিকা লইয়া আসিয়াছে; দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্দশা—ইহারাই আজ বিজ্ঞানের অনুচর। শত শতাব্দী ধরিয়া মানুষ যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়াছিল, নির্মমভাবে বিজ্ঞান আজ তাহাকে হত্যা করিয়া মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া আনিয়াছে। বিবর্তনের পথে মানুষ যে পিছু হাঁটিতে শুরু করিয়াছে সে তো বিজ্ঞানেরই হাতছানিতে—সে কথা অস্বীকার করিবার পথ কৈ?

বিজ্ঞানের এই দানবীয় রূপটাই বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্র বেশী প্রকটিত ও পরিস্ফুট। তবুও ইহাই বিজ্ঞানের সত্য ও সমগ্র পরিচয় নয়। অগণিত জনগণের কল্যাণানুষ্ঠানে, মানুষকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে, নিপীড়িত অধঃপতিত শক্তিহীন কোটি মানবের সর্বাঙ্গীণ দৈন্য মোচন করিবার জন্য বিজ্ঞান কোথায় কি করিতেছে সে খবর প্রায় সর্বত্রই অজ্ঞাত, কেননা লেবরেটরী ও বক্তৃতামঞ্চের ব্যবধান অনেকখানি, কুটিল রাজনীতির চাপে ও বিভিন্ন কূটনৈতিক প্রচারভিড়ে বিজ্ঞানের কল্যাণীমূর্তি লোকচক্ষুর বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যবনিকার অন্তরালে রক্ষিত বিজ্ঞানের সেই আলোকরূপ উদঘাটিত করিবার সামান্য চেষ্টা করিয়াছি।

এই গ্রন্থরচনার পূর্বে উপকরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহার্থ কয়েকখানি গ্রন্থপাঠ করিয়াছি, এখানে তাহার উল্লেখ কর্তব্য মনে হইতেছে। মাইখেলোফ-কৃত সোভিয়েট জিওগ্রাফী, ফার্সম্যান-কৃত সোভিয়েট সায়েন্স, মলোটোফ লিখিত থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এবং ইউ-এস্-এস-আর স্পীকস ফর ইট সেলফ নামক

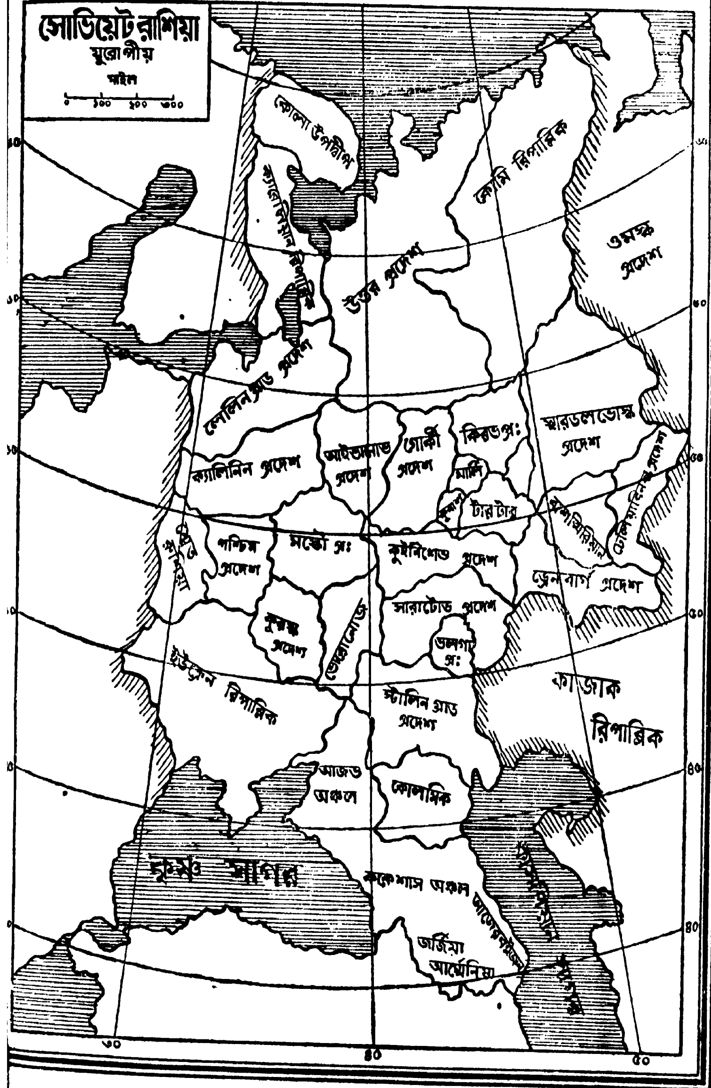
সংকলন গ্রন্থ ও এতদ্ব্যতীত সায়েন্স এণ্ড কালচার, পিপল্‌স্-ওয়ার প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা পঠিত গ্রন্থাদির অন্তর্ভূর্ত।

এই পুস্তক রচনাপ্রসঙ্গে বন্ধু ও সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত স্নেহভাজন শ্রীমান্ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করাও সঙ্গত মনে করিতেছি। ইঁহারা আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রেরণা ও সাহায্য না দিলে এই কার্যে ব্রতী হওয়া সম্ভব ছিল না। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত মানচিত্রগুলি অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহাদের সকলের উদ্দেশে মামুলী কৃতজ্ঞতার অবতারণা করিয়া অন্তরের যোগাযোগের অবমাননা করিতে চাহি না। নিবেদন ইতি।

বাণী-নিকেতন
পিঙ্গনা (ময়মনসিংহ)

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মাতৃচরণোদ্দেশে



সোভিয়েট রাশিয়া
য়ুরোপীয়
মাইল
০ ১০০ ২০০ ৩০০
কোলা উপদ্বীপ
কোমি রিপাব্লিক
ওমস্ক প্রদেশ
উত্তর প্রদেশ
লেনিনগ্রাড প্রদেশ
ক্যালিনিন প্রদেশ
আইভানোভ প্রদেশ
গোর্কী প্রদেশ
কিরভ প্রঃ
স্বারডলভোস্ক প্রদেশ
মারি
টারটার
পশ্চিম প্রদেশ
মস্কো প্রঃ
কুইবিশেভ প্রদেশ
অরেনবার্গ প্রদেশ
কুরস্ক প্রদেশ
ভোরোনেজ
সারাটোভ প্রদেশ
ইউক্রেন রিপাব্লিক
স্টালিন গ্রাড প্রদেশ
কাজাক রিপাব্লিক
আজভ অঞ্চল
কোলমিক
কৃষ্ণ সাগর
ককেশাস অঞ্চল
জর্জিয়া
আর্মেনিয়া
৩০
৪০
৫০

বিজ্ঞান ও সোভিয়েট

প্রতিকূল পরিপার্শ্বকে পরাভূত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার প্রয়োজন ও প্রেরণা এবং মানুষের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা এই দুইটিই বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনীর অন্তরের কথা। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিণত রূপের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সার্থকতা রূপ পাইয়াছে প্রায়শ বিলাসের উপকরণের যোগান দিয়া। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান আর কতটুকু কাজে লাগিতেছে! এডিসন যদি বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, মার্কনির চেষ্টায় বেতারবার্তা যদি বাস্তব রূপ পাইয়া থাকে, ফারমি যদি য়ুরেনিয়ম পরমাণুকে ভাঙিয়াই থাকেন তাহাতে বিশ্ব-মানবের কল্যাণ কতটা হইয়াছে? যে চাষী মাটি খুঁড়িয়া পৃথিবীর খোরাক যোগায়, যে কারিগরের হাতের টিপে পৃথিবী পাইতেছে নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ, র‍্যাডাররশ্মির অবিষ্কার তার কোন উপকারে আসিতেছে, রকেট প্লেনের ঘণ্টায় ৬০০ মাইল গতি তার অনশনক্লিষ্ট প্রাণে কোন আশার বাণী বহন করিয়া আনিতেছে? তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সে যত বড় বিস্ময়করই হোক না কেন, তার মনে কোন রেখাপাত করে না বা ঔৎসুক্য সৃষ্টিও করে না। সে দেখে বিজ্ঞান তার বাস্তবজীবনে কোন প্রাচুর্য আনে না, কর্মক্লান্ত দেহকে দেয় না কোন আরাম, বরং সে উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করে যে বিজ্ঞানের সাফল্যে তার জীবনের দুঃখ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাই একথা

বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না যে, বিশ্বমানবের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের শুভকরী যোগ খুবই সামান্য। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উদাসীন তাহার কারণ জনকল্যাণে বিজ্ঞানের পরাঙ্মুখতা। অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সুর মিলাইয়া সাহিত্যদর্শন-কাব্যকলার মতই বিজ্ঞান সেবা করিয়াছে ধনতন্ত্রের এবং এই দাসত্বের ভিতর দিয়াই বিজ্ঞান পরোক্ষভাবে জনকল্যাণের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা বিজ্ঞানেরই দান, তাই প্রচলিত ধনতান্ত্রিক শোষণের জন্য বিজ্ঞানও দায়ী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া বিজ্ঞানকে নিয়োগ করিলে পৃথিবীতে সর্বজনলভ্য সুখ ও সমৃদ্ধি অবাস্তব নয়, সোভিয়েট রাশিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

মার্কসীয় দর্শনানুসারে বিজ্ঞানের কার্য কেবল অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্তিতে শেষ হইলে চলিবে না, বিজ্ঞানকে করিতে হইবে নব নব কল্যাণকর সৃষ্টি। সত্যানুসন্ধান বা নৈসর্গিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ-নির্দেশের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বিজ্ঞানের কার্য সীমাবদ্ধ হওয়াই বিজ্ঞানের একান্ত সার্থকতা নহে, বিজ্ঞান প্রকৃতিকে ঢালিয়া সাজাইবে, তারই চেষ্টায় প্রকৃতি হইবে বিশ্বমানবের আজ্ঞাবহা। বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটি সুস্পষ্ট কর্মধারা পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বস্তুজগতের ঘটনাবলীর রহস্য উদ্ঘাটনই ছিল বিজ্ঞানের কার্য। এই কর্মপদ্ধতিকে আমরা তত্ত্ববিজ্ঞানরূপে অভিহিত করিতে পারি। এই তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রাণপদার্থ ছিল যুক্তিশাস্ত্র। ঊনবিংশ শতকীয় বিজ্ঞানের কার্যের সারকথা ব্যক্তিগত ব্যবহারিক বা পরীক্ষামূলক সিদ্ধি। বিংশ শতকে বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ সংঘটিত হইয়াছে। এই যোগাযোগ দ্বারাই সোভিয়েট রাশিয়া জনগণকে ব্যাপক সমৃদ্ধির অধিকারী করিয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও এতাবৎকাল সমাজগঠনে ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানকে আবশ্যকীয় মনে করা হইত না। সমাজের উন্নতস্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বৃত্তিধারী লোক আছে—বণিক সম্প্রদায়, ভূস্বামী, ব্যবহারজীবী, ধর্মযাজক প্রভৃতি। ইঁহারাই সমাজের নেতা, কিন্তু ইঁহাদের অনেকেরই বিজ্ঞানের সঙ্গে কোন বাস্তব পরিচয় থাকিত না। এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে তাঁহারা বিজ্ঞানের কল্যাণকর শক্তির স্বরূপ অবগত হইতেন না এবং বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীনই থাকিতেন। ইঁহাদের ভিতর হয়ত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন অল্পসংখ্যক কয়েক-জন স্বার্থান্বেষী লোক বিজ্ঞানের শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহশীল হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যবর্তিতায় বিজ্ঞান কোথায়ও বা সমাজজীবনে প্রবেশ করিত; কিন্তু এই জাতীয় কার্যের নীতি ছিল পরিপূর্ণরূপে শোষণ। ইঁহাদের পোষকতায় বর্ধিত প্রচেষ্টাগুলির ভিতর দিয়া সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের যতটুকু পরিচয় ঘটিত তাহাতে লোকের সম্মুখে এই সত্যই উদ্ভাসিত হইত যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিবাদী বা শিল্প-পতি অপর দশজনকে বঞ্চিত করিয়া ও সমাজের একশ্রেণীর লোককে শোষণ করিয়া নিজেরা ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্য কোন রূপ লোকের চোখে পড়িত না। এই পরিপ্রেক্ষিতের সম্মুখীন হইয়া রক্ষণশীল ও আদর্শবাদী দার্শনিকেরা বিজ্ঞানকে যন্ত্র-দানবের স্রষ্টা বলিয়া আখ্যা দিয়া বিজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞাই প্রচার করিতেন। সমাজসংগঠন ব্যাপারে কিংবা সর্বজনীন কল্যাণকার্যে বিজ্ঞানের কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে, এতকাল পর্যন্ত কেহ তাহা বিশ্বাস করিবার হেতু কমই পাইয়াছে।

সর্বদেশেই বিজ্ঞানের প্রতি এই অভিন্ন মনোভাব ছিল। ইহার মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনীতির কর্ণধারগণের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা। রাজনীতিতে দক্ষতা অর্জন করার অর্থ ছিল প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, সাহিত্য ও অর্থনীতির মামুলী শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ। এবম্প্রকার গতানুগতিকভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিরাচরিতকে অনুসরণ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতেন, নূতন বলিষ্ঠ পরিকল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমাজগঠনের কথা চিন্তা করা তাঁহাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত বৈজ্ঞানিক কর্মিগণও বস্তুতান্ত্রিক ও ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে প্রায়শ উদাসীন থাকিতেন। এই সকল কারণে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজ জীবনের কোন কল্যাণকর যোগাযোগই ছিল না।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশেই যৎকালে বিজ্ঞানের প্রতি এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল, সেই সময়ে জার-শাসিত রাশিয়ায় তদতিরিক্ত কিছু আশা করা উচিত নহে। কারণ রাশিয়া ছিল তদানীন্তন পশ্চাৎপদ দেশগুলির অন্যতম। যদিও ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দেই পিটার দি গ্রেটের আমলে 'একাডেমী অফ সায়েন্সেসের' প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তবুও তৎকালীন রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার দেয় নাই। বিজ্ঞানীর কার্য গৃহকোণেই অগ্রসর হইতেছিল, রাজদরবারে তার ঠাঁই ছিল না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন নূতন রাশিয়ার অভ্যুত্থান হইল তখন দেশের সর্বত্র নিদারুণ অভাব ও দারিদ্র্য বিরাজিত, গৃহবিবাদ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও শোষণ তখনও উৎপাটিত হয় নাই। চতুর্দিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত রাশিয়ায় তখন জীবনধারণোপযোগী উপকরণের একান্ত অনটন। রাষ্ট্রনায়ক লেনিন ও তাঁহার সহকর্মিগণ

দেখিলেন যে জাতিকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে সর্বরূপে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা রচিত হইল। লেনিনের রাষ্ট্রবিপ্লব কেবল তদানীন্তন শাসনব্যবস্থার বিরোধী আন্দোলন নয়, বরঞ্চ তাঁহার দৃষ্টি বেশীর ভাগই নিবদ্ধ ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা ও তদীয় নিরাকরণের দিকে। সেই জন্য তাঁহার উক্তিগুলি মানুষের ভাবাবেগকে আন্দোলিত না করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকেই উদ্বুদ্ধ করিত। তদানীন্তন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অনেকেই বলশেভিক মতবাদের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু লেনিন তাঁহাদের প্রত্যেককে স্বমতে আনিয়াছিলেন, বলপ্রয়োগে নয়—পরিকল্পনা দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে নবরাশিয়ার গঠন কার্যে বিজ্ঞানের স্থান কত উচ্চে ও তাহাতে বিজ্ঞানের হাতই বা কতটুকু রহিয়াছে। বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের সাহায্যেই রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। সোভিয়েট জাতীয় জাগরণের প্রথম দিকেই অর্থনৈতিক বিবর্ধন পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্যের জন্য নিয়োজিত হইলেন বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী। ১৯১৯—২০ খ্রীষ্টাব্দে দেশের সর্বত্র বৈদ্যুতিক শক্তিকে সহজলভ্য করিয়া দিবার ভার বিজ্ঞানীদের উপর অর্পিত হইল। রাশিয়ার জাতীয় বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ইহাই প্রথম স্তর। তখন দেশময় দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। কিন্তু জাতি সেদিন স্পষ্ট দেখিতে পাইল যে সমগ্র জাতিকে বাঁচিতে হইলে বিজ্ঞানীকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ও সর্বাগ্রে দেশময় গড়িয়া তুলিতে হইবে বৈজ্ঞানিক কর্মীসংঘ। তাই ম্যাক্সিম গোর্কীর উদ্যোগে তদানীন্তন শাসনতন্ত্রের প্রধান ও অন্যতম কার্য ছিল বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর ভরণপোষণ ও বাসগৃহাদির সুব্যবস্থা

করা, তাহাদের জন্য যন্ত্রপাতি ও পুস্তকাদি সরবরাহ করা। দারুণ অনটনের মধ্যেও সেদিন সোভিয়েট শাসনতন্ত্র যাঁহাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছিল অচিরকালমধ্যে তাঁহারা জাতির সম্মুখে বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সোভিয়েট উন্নতির মূলকথা অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের যোগাযোগ। জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের নিবিড় সংযোগকে সোভিয়েট জাতীয় অভ্যুত্থানের মন্ত্রশক্তি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের স্থান অনন্যসাধারণ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার ও উন্নতি হইয়াছে বা হইতেছে তাহা প্রায়শ উদ্দেশ্যবিহীন, হয়ত বা আকস্মিক বা স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করা হইয়াছে নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনায় দেশের অর্থনৈতিক বিবর্ধনে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অর্থনৈতিক দিকটি প্রায় সকল দেশেই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে বা পুঁজিপতির কুক্ষিগত হইয়া উহা শোষণের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুজাগতিক সত্যানুসন্ধানের সার্থকতা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অর্থনীতি ও বিজ্ঞান এই দুই শাস্ত্র ছিল দুইটি পৃথক জগতের ব্যাপার। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিলেও বিজ্ঞান ছিল সেখানে অপাংক্তেয়। অন্যান্য দেশের মতই জারের আমলে রাশিয়ার শিক্ষায়তনগুলিতে পদার্থ-বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন বিজ্ঞানের স্থান ছিল না। ভূগোলশাস্ত্র ছিল কতকগুলি সাগর-নদী-পর্বত-জনপদ-দ্বীপদেশের তালিকা। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ইহার অবসান ঘটিল। নূতনতম দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নূতন অর্থশাস্ত্র রচিত হইল যাহার ভিত্তি রহিল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধির উপরে। এক্ষণে সোভিয়েট রাশিয়ায়

প্রায় সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই ব্যবহারিক দিকটাতে অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া হয়। কোন আবিষ্কারই অহেতুক বা দৈবাৎ নহে। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক কর্মী নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া গবেষণায় রত। বিজ্ঞানকে অনেক উঁচুতে স্থান দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রের অধীনে ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও বৈজ্ঞানিক কর্মীর উদ্ভব হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর আগে 'একাডেমী অফ সায়েন্সেসের' অধীনে বিভিন্ন শাখায় মাত্র ৯৩ জন কর্মী ছিল; এখন সেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়নী, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা বিভাগে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে ২১৭, ৩৬৭, ৩০২ ও ৬৩৯। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন শাখা ছিল না, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অধীনে ৫৮টি শাখা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে একাডেমীর সভ্য সংখ্যা ৪৫ হইতে বাড়িয়া ১৩০ হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বৈজ্ঞানিক গবেষকের সংখ্যা ১০৯ হইতে ৩৪২০ তে দাঁড়াইয়াছে।

সোভিয়েট জাগরণের সূচনাতেই জনগণের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক কর্মী ও কৃতী ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই কর্মীদের ভিতর শত শত সাধারণ স্তরের লোকও স্থান পাইল। বিজ্ঞানালোচনা অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া হইয়া রহিল না। ইহাদের আবিষ্কারের সত্যগুলি নিয়োজিত হইল জনকল্যাণকার্যে, জনগণকে শোষণ করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বিত্তশালী করিবার জন্য নহে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক বিবর্ধন, কিন্তু ইহার মূলে ছিল সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি। বিজ্ঞানালোচনা ও এতদ্বিষয়ে গবেষণাও তাই কতকগুলি সুচিন্তিত পরিকল্পনার উপর

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রের অধীন যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার স্থাপিত হইল তাহাদের মূলনীতি হইল—(১) বিভিন্ন গবেষণার সমীকরণ, একের আবিষ্কারের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ দ্বারা সমগ্র সত্য পাইবার ব্যবস্থা ; (২) বিভিন্ন শাখার যোগাযোগ ; (৩) বিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক দর্শন হিসাবে আলোচনা না করিয়া উহার সত্যকে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চর্চা ; (৪) তাত্ত্বিক ও ফলিত বিজ্ঞানের সমন্বয় ও যোগাযোগ এবং (৫) শিল্প, কৃষি ও সংস্কৃতির পরিপোষণে বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ। সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা রাষ্ট্রের অধীন বলিয়া সকলেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন—জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি। এই লক্ষ্যকে সহজলভ্য করিবার জন্য ৯০২টি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, কতকগুলি নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অপরগুলি বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে পড়ে—একাডেমী অফ সায়েন্সেস, লেনিন অল-য়ুনিয়ন একাডেমী অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস এবং গোর্কী ইন্‌স্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প ও কৃষির বিভিন্ন শাখার অঙ্গীভূত এবং আয়তনে ক্ষুদ্রতর। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেগুলি নিরাকরণের বৈজ্ঞানিক উপায় নির্ধারণের ব্যবস্থা করে। ইহাদের পরামর্শমত এবং ইহাদের পরিকল্পিত সূত্র অবলম্বন করিয়া বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব বিষয়ে গবেষণা করে এবং ফলাফলের বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে জানায়। এতদ্ব্যতীত বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কার্য বিভিন্ন শিল্প বা কৃষি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা ও তাহাদের ছোটখাট সমস্যা নিরাকরণ করা। এই প্রকার ধারাবাহিত ও সুশৃঙ্খলিত নিয়মে কার্য

করিবার ফলে নব নব শিল্প ও কৃষিপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতেছে। যে সকল বিষয় নিজেদের গণ্ডীর বহির্ভূত সেই সব বিষয়ে পরামর্শ পাইবার জন্য ইহারা সর্বদা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। শিল্প বা কৃষি-প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন গবেষণাগারসমূহকে আবশ্যক-মত সাহায্য করাও বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম কার্য। মোটের উপর সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য নব নব উপায় উদ্ভাবন; বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের উপর ভার দেওয়া হয় সেগুলিকে বাস্তবরূপ প্রদান করিবার জন্য। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র বা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইলেও প্রত্যেক গবেষণাকারীর স্বাধীন প্রচেষ্টা করিবার সুযোগ আছে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তারা দেশের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বার্ষিক কর্মপদ্ধতি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া দেন। বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তদনুযায়ী গবেষণা করিয়া থাকেন। বার্ষিক পরিকল্পনা স্থির করিবার পূর্বে প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্যপদ্ধতি নির্ণীত হয়।

সকল পরিকল্পনার মূলকথা দেশের সম্পদবৃদ্ধি ও শিল্পসম্পদে অন্যান্য দেশকে অতিক্রম করা। কারখানায় তৈয়ারী মাল বা কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে জনপ্রতি হার যেন অন্য দেশের চেয়ে বেশী হয় ইহাই লক্ষ্য। ঐ দিক দিয়া সাফল্যলাভ করিবার জন্য সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কৃষিজাতদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন ও শিল্পসম্পদ বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরীণ বহু দুর্গম স্থানে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ প্রাকৃতিক কাঁচামালের সন্ধান দিতেছেন। অপর বিজ্ঞানীরা ইহাদের ব্যবহারিক সার্থকতা উদ্ভাবন করিতেছেন। ইহারই ফলে নূতন শিল্প গঠিত হইয়াছে। অতীতে যেখানে ছিল ধূ ধূ মরুভূমি, এখন সেখানে

বিরাট শিল্পকেন্দ্র বিরাজ করিতেছে। মানুষের পক্ষে একদা দুষ্প্রবেশ্য অঞ্চল শস্যসম্ভারে ঝলমল করিতেছে। নূতন রেলপথ, নূতন রাস্তা দুর্গম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মানবগোষ্ঠীকে নূতন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানচিত্রের গায়ে নূতন দেশ ফুটিয়া উঠিতেছে। ধরিত্রীর গর্ভে লুক্কায়িত নূতন এক পৃথিবী আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেখানে রহিয়াছে অফুরন্ত সম্পদ। প্রাকৃতিক শক্তিকে নানা উপায়ে স্ববশে আনা হইতেছে। মরুপ্রদেশে বহিতেছে নূতন জলস্রোত, জলাভূমির জলকে দূর করিয়া দিয়া সেখানে করা হইতেছে কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা। কোন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোথায়ও বা বৃক্ষবিরল প্রদেশকে সবুজশোভায় সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। অল্প খরচে শক্তি উৎপাদন করিবার জন্য ব্যাপক বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ব্যবস্থা, জলস্রোত হইতে শক্তি পাওয়ার উপায় নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র অদ্ভুত প্রগতি দেখাইয়াছে। এই সব ব্যবস্থার ফলে সামান্য কৃষক পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুফল লাভ করিতেছে, সামান্য শ্রমিক জানিতেছে বৈজ্ঞানিক কর্মধারার উপকারিতা। পঁচিশ বৎসর আগে যে দেশের অবস্থা পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা হীন ছিল সেই দেশ আজ কৃষিজাত দ্রব্যোৎপাদনে, কৃষিযন্ত্রাদি নির্মাণে জগতে সর্বোচ্চ স্থানে রহিয়াছে। স্বর্ণ ও লৌহ এই দুই খনিজ সম্পদে রাশিয়া আজ পৃথিবীতে দ্বিতীয়স্থানীয়। সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের কর্ম ও চিন্তাধারা একত্র গ্রথিত করিতে হইয়াছে, সহস্র সহস্র বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। অর্থনীতি, রসায়নী, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, পূর্তকার্য, কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের যোগাযোগ সংঘটিত হওয়ার ফলে বিজ্ঞানের কতকগুলি নূতন নূতন শাখার উদ্ভব হইয়াছে।

বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও ঔৎসুক্য বর্ধিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানপিপাসা ও অনুসন্ধিৎসা মিটাইবার জন্য সহস্র সহস্র বিজ্ঞানের পুস্তক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত হইতেছে। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারের পাঠকসংখ্যা ৭গুণ বর্ধিত হইয়াছে, গবেষণাকারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে ১৫ গুণ, বৈজ্ঞানিক কর্মীর সংখ্যা ২০ গুণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৪০ গুণ বর্ধিত হইয়াছে। গবেষণাগারের বিজ্ঞানীর সঙ্গে জনগণের সম্বন্ধ আজ নিবিড় ও অপরিহার্য। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সোভিয়েট জনগণ ও রাষ্ট্রের অঙ্গে যে ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণও ইহাই যে, সোভিয়েট য়ুনিয়নে বিজ্ঞান সর্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত রহিয়াছে, একের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বহুর বিনাশের যন্ত্রস্বরূপে কার্য করিতেছে না। এই কারণেই সমগ্র জাতি ও দেশ বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় কোন বিজ্ঞান বিষয়ের বক্তাকে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক শ্রোতার সম্মুখীন হইতে হয়—পৃথিবীর অন্য কোন দেশে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। কেলার নামক একজন বিজ্ঞান-পরিষদের সদস্য 'উদ্ভিদজীবন' বিষয়ক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—দুই লক্ষ কৃষক তাঁহার বই পাঠ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জনগণের এই যে আগ্রহ ইহার বহুমুখী ফল ও কার্য রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে 'লেবরেটরী' একটি অতি আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে কৃষক ও কৃষির সহিত বিজ্ঞানের নিত্য নিবিড় সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে।

ভৌগোলিক পরিচয়

সোভিয়েট জনজাগরণের ফলে রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন হইয়া থাকিলেও ভৌগোলিক রূপটা বদলাইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। পূর্বে যেখানে অরণ্য ছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যে হয়ত সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে জনপদ, মরুভূমি রূপান্তরিত হইয়াছে বৃক্ষসমাকীর্ণ শ্যামল প্রান্তরে, যেখানে জলাভূমি ছিল সেখানে হয়ত নূতন কৃষিক্ষেত্র তৈয়ারী করা হইয়াছে। নূতন নদী, নূতন খাল কোনও কোনও অঞ্চলের ভৌগোলিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে—এক দেশের মানুষ নূতন দেশের অধিবাসী হইয়া যাইতেছে। এমনই সব বিস্ময়কর প্রাকৃতিক রূপান্তর সোভিয়েট সমৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য। সেই রূপান্তরের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে শুধু বর্তমান রাশিয়াকে জানিলে চলিবে না, ভূতপূর্ব রাশিয়াকেও চিনিতে হইবে। রাশিয়ার উন্নতিকে উপলব্ধি করিতে হইলে রাশিয়ার ভূপ্রকৃতি, ভৌগোলিক বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্যের কথা জানিতে হইবে।

উত্তর মেরু হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিয়ার সীমানা দক্ষিণে প্রায় ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত প্রশান্ত মহাসাগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—পশ্চিমে রাশিয়ার বিস্তৃতি অর্ধ-য়ুরোপ জুড়িয়া। এই বিশাল ভূখণ্ড পূর্ব-পশ্চিমে ইউরাল পর্বতদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। পশ্চিমাংশে য়ুরোপীয় রাশিয়া ও পূর্বাংশে সাইবেরিয়া বা এশিয়াটিক রাশিয়া। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুবিধ প্রাকৃতিক অনৈক্য রহিয়াছে।

য়ুরোপীয় রাশিয়ার উত্তরাঞ্চল মেরু হইতে আরম্ভ করিয়া মোটামুটি ৬৫° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত বলা যাইতে পারে। এই অঞ্চল ভূগোলে তুন্দ্রাঞ্চল বলিয়া খ্যাত। এখানে শীত দীর্ঘ, শীতের প্রখরতা বেশী, নদীগুলি প্রায় বৎসরের সাতমাস বরফাচ্ছন্ন থাকে। গ্রীষ্মে যখন বরফ গলে তখন দেশের কতকাংশ জলাভূমিতে পরিণত হয়। শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ এবং কিছু জলজ উদ্ভিদ ভিন্ন এখানে অন্য কোন বৃক্ষাদি বড় জন্মে না। এখানে সেখানে ছোট ছোট পাহাড়পর্বত। এই অঞ্চলে রাশিয়ার কোলা উপদ্বীপ, কোমি রিপাব্লিক, ওমস্ক প্রদেশ। এখানেই মুরমানস্ক বন্দর—উত্তর সাগরে ইহাই একমাত্র বন্দর যেখানে সাগরের জল দারুণ শীতেও জমিয়া বরফ হয় না। এতদ্দেশের অধিবাসীরা যাযাবর ল্যাপ। শ্বেতভল্লুক, সীল, সিন্ধুঘোটক, শ্বেত-শৃগাল, বলগাহরিণ প্রভৃতি এখানকার পশু।

তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণভাগে কিছু কিছু খর্ববৃক্ষের ঝোপ ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদাদি দেখা যায়। তৎপরে রহিয়াছে পাইন, ফার, বার্চ প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষাদির বন। ৬৫° হইতে ৬০° অক্ষাংশের অন্তর্গত ক্যারেলিয়ান রিপাব্লিক, লেনিনগ্রাদ প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, স্বারডলোভস্ক প্রদেশ এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই সব স্থানে ইতিপূর্বে চাষাবাদের কোন সুযোগ ছিল না। ইহার পরে আরও ৫° অক্ষাংশ দক্ষিণে চলিয়া আসিলে পাওয়া যাইবে রাশিয়ার মধ্যভাগ—ইহার কেন্দ্রে অবস্থিত মস্কৌ প্রদেশ ও মস্কৌ নগরী। মস্কৌ প্রদেশের পশ্চিমভাগে রহিয়াছে কালিনিন প্রদেশ, তাহার দক্ষিণে পশ্চিম প্রদেশ, শ্বেত রাশিয়া। এতদঞ্চলে জলবায়ুর তীব্রতা মৃদুতর হইয়া আসিয়াছে, বনভূমি ক্ষীয়মান হইতেছে, বিরাট বনস্পতির স্থলে পর্ণমোচী ওক, উইলো, চেস্টনাট, এলম, পপলার প্রভৃতি এবং

কিছু কিছু ফলবান বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্কৌ হইতে পশ্চিমাঞ্চলে অগ্রসর হইলে পাওয়া যাইবে গোর্কী প্রদেশ, কীরভ প্রদেশ, টারটার রিপাব্লিক, বাশখিরিয়ান রিপাব্লিক প্রভৃতি।

আরও দক্ষিণে ৫৫°-৫০° অক্ষাংশে রাশিয়ার বিখ্যাত স্তেপভূমি। এই অঞ্চলে বৃক্ষবিরল কুরস্ক, ভোরোনেজ, কুইবিশেভ, সারাটোভ প্রদেশ। সোভিয়েট জাগরণের পূর্বে এই অঞ্চল কৃষিকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকার সমভূমি মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। অতঃপর যত দক্ষিণে যাওয়া যাইবে বৃক্ষবিরলতা তত বর্ধিত হইবে। এখানে রহিয়াছে শস্যবহুল ইউক্রেন, স্টালিনগ্রাড প্রদেশ। ভলগা নদী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত। এই ভূভাগ ক্রমশ কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই অঞ্চলে জলবায়ু ভূমধ্য-সাগরীয়।

ককেশাস অঞ্চলের উত্তরাংশ সমতল বটে, কিন্তু দক্ষিণভাগ বন্ধুর পর্বতসমাকীর্ণ। কৃষ্ণসাগর ও কাসপিয়ান সাগরকে সংযোগ করিয়া তুষারশীর্ষ ককেসাস পর্বতমালা রহিয়াছে। এখান হইতে দুর্গম গিরিপথ দিয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলে ট্রান্স্ককেসীয় রিপাব্লিকের অধীন জর্জিয়া ও আরমেনিয়া অঞ্চলে উপনীত হওয়া যাইবে। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলভাগ পাম তরুরাজি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় একেবারে সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে অনুর্বর পার্বত্য ভূমি আবার অন্যত্র বৃক্ষ সমাকীর্ণ কৃষিভূমি। কোথায়ও সূর্যের প্রখর-কিরণ-তপ্ত বারিহীন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, কোথায়ও আবার বিরামবিহীন বারিবর্ষণের ফলে চিরন্তন জলাভূমি। কাসপিয়ান হ্রদের তীরে তৈলের খনির জন্য বাকু বন্দর। আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলে তুরস্কের সীমানা।

য়ুরোপীয় রাশিয়ার পূর্বপ্রান্তে ইউরাল পর্বত। এই পার্বত্য অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। বহুকাল পূর্ব হইতেই এখানে খনিজ শিল্প প্রচলিত থাকিলেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীনে এখানে এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত য়ুরোপের বৃহত্তম লৌহের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই ইউরাল পর্বতের পূর্বসীমানায় এশিয়াটিক রাশিয়া। য়ুরোপীয় রাশিয়ার মতই এই ভূখণ্ড উত্তরমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরাংশের ভূপ্রকৃতি য়ুরোপীয় রাশিয়ার অনুরূপ অঞ্চলের ন্যায়। বিস্তীর্ণ বনভূমিতে বিরাটাকৃতি বৃক্ষাদি ও জলাভূমি উত্তরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণে সরিয়া আসিলে আবার সেই স্তেপ-ভূমি, কৃষ্ণমৃত্তিকার দেশ। উত্তরে ওমস্ক প্রদেশ মেরু সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ওমস্কের দক্ষিণে ইউরাল পর্বত ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার সীমান্তে কাজাকাস্থান। একদা এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই যাযাবর ছিল। এখানে সীমাহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর—নদী নাই, বৃক্ষ নাই। স্তেপভূমির তৃণাচ্ছাদিত প্রদেশে পশুচারণ ক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় সেখানকার প্রকৃতির রূপ বদলাইয়াছে। খনিজশিল্পের প্রসারে এই দেশের প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে নূতন কারখানা ও নবপ্রতিষ্ঠিত রেল লাইন দ্বারা।

কাজাকাস্থানের দক্ষিণে মধ্যএশিয়া। পাঁচটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র ইহার অন্তর্ভুক্ত—উজবেক, তুর্কমেন, তাজিক, খীরগিজ এবং কারা কালপাক। সোভিয়েট রাশিয়ার ইহাই সর্বদক্ষিণ সীমানা। ইহার পরে ইরান, আফগানিস্থান এবং চীনদেশ। মধ্যএশিয়ার সীমান্ত হইতে ভারতবর্ষের সীমা দশ মাইলের অনধিক দূরবর্তী।

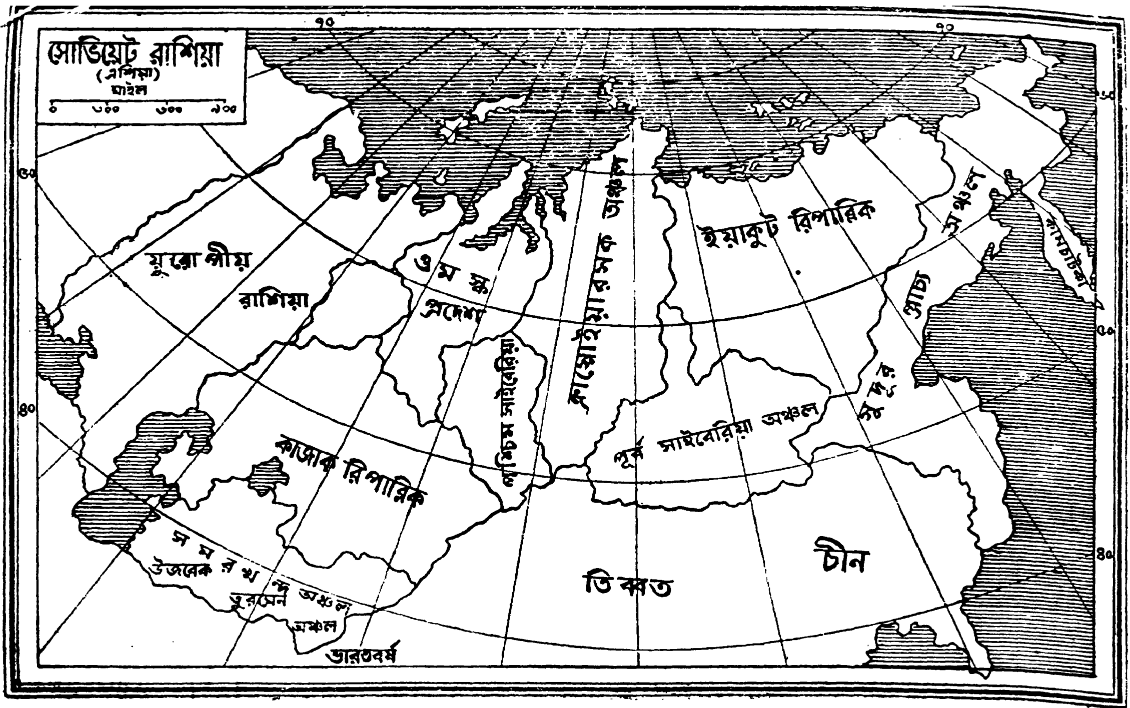
বিপ্লবের পূর্বে মধ্য এশিয়া যাযাবর, দাস ও শ্রমিকের

দেশ ছিল। কিন্তু সেদিন আর নাই ; এখন এই দেশে জাতীয়তা, কৃষি ও শিল্পের অভ্যুত্থান হইয়াছে।

এখানকার ভূমি সমতল, বাতাসে জলীয় বাষ্পের অভাব, সুর্যতাপ প্রখর—সুদূর-বিস্তৃত কারাকুম মরুভূমি। ইহার দক্ষিণে পামীর ও তিয়েনসান পর্বত, চিরতুষারের দেশ। এই বরফ গলা জলে কিজিলকুম মরু অঞ্চলে জলসেচন দ্বারা কৃষিকার্য করা হইতেছে।

পশ্চিমে সাইবেরিয়ার নিম্নভূমির পূর্বদিকে আবার পর্বতশ্রেণী। এই পার্বত্যদেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে ইনিসি, লেনা ও আমুর নদী। পার্বত্য চড়াই উতরাই শেষ হইয়াছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে। ইহার উত্তরাংশে ইয়াকুট রিপাব্লিক—আয়তনে প্রায় সমগ্র য়ুরোপের সমান। বেগবতী নদী, সীমাশূন্য অরণ্য, অফুরন্ত খনিজ সম্পদ এই দেশকে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে বিরাট সমুদ্রের ন্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ বৈকাল এই প্রদেশে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ অঞ্চল সাতিশয় সমৃদ্ধ। ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথ এই স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইলে প্রশান্ত মহাসাগর পাওয়া যাইবে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে শাখালীন দ্বীপ। ইহার উত্তরাংশ সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত। শাখালীনের উত্তরে কাম্‌চাটকা উপদ্বীপ, আগ্নেয়গিরির দেশ। এই উপদ্বীপ ছাড়িলেই আবার উত্তরমেরু সাগরের তীরে পৌঁছান যাইবে। উত্তর মেরুসাগরের দ্বীপাবলীও সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্ভূ‘ত। একদা পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত এই দ্বীপাবলী বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রিকের


সোভিয়েট রাশিয়া
(এশিয়া)
মাইল
০ ২০০ ৬০০ ৯০০
যুরোপীয় রাশিয়া
ওমস্ক প্রদেশ
পশ্চিম সাইবেরিয়া
ক্রাস্নোইয়ারস্ক অঞ্চল
ইয়াকুট রিপাব্লিক
কামসাট্কা
পূর্ব সাইবেরিয়া অঞ্চল
কাজাক রিপাব্লিক
উজবেক
তুর্কমেন অঞ্চল
ভারতবর্ষ
তিব্বত
চীন

আবাসস্থল। এখানে কেবল তুষারের পর তুষার। সেই তুষার-রাজ্যকে অতিক্রম করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রের সীমান্ত উত্তর মেরুতে গিয়া শেষ হইয়াছে।

রাশিয়ার ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও সীমানা এইরূপ। কিন্তু রাশিয়ার ভূগোল দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে। শুধু যে দেশের সীমা বদলাইতেছে তাহা নহে, দেশের ভূপ্রকৃতিরও নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। সাগরনদী, অরণ্যপ্রান্তর, মরুপর্বত ইহারাও দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তাই বই-এর পাতায় আঁকা ও লেখা ভূগোলের বৃত্তান্ত বাস্তব ভৌগোলিক সংস্থানের সঙ্গে সমতালে চলিতে পারিতেছে না। প্রচণ্ড এক পরিবর্তনের তরঙ্গ চলিয়াছে সমগ্র দেশের উপর দিয়া। নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতা, নবতম দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনপ্রবাহ অতীতের রাশিয়ার পূর্বতন ভূগোলের রূপান্তর করিয়া চলিয়াছে।

বৃহত্তর রাশিয়া

বিচিত্র দেশ রাশিয়া! প্রাকৃতিক বহুবিধ অনৈক্য ও বৈচিত্র্যের সমাবেশে গ্রথিত হইয়াছে একটা গোটা দেশ—পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ, আয়তনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তিনগুণ, ইংলণ্ডের চেয়ে নব্বই গুণ বড়—বেলজিয়মের মত দেশের সাতশতটিকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে রাশিয়ার অভ্যন্তরে। য়ুরোপের পূর্বাঞ্চল ও এশিয়ার উত্তরাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে সমগ্র সোভিয়েট য়ুনিয়ন। এই বিরাট দেশে বিভিন্ন আবহাওয়া, তথাকথিত বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি। মাটিতে কত না বৈচিত্র্য! উত্তর মেরু অঞ্চলে অনুর্বর চিরতুষার ক্ষেত্র, আবার কৃষ্ণসাগরতীরবর্তী ট্রানস্‌ককেশাস অঞ্চলে রহিয়াছে বৃষ্টিবহুল প্রদেশ; সেখানে শীতকালেও গরম, মাটি লাল, বৎসরে তিন চার বার শস্যোৎপন্ন হইতেছে। কাস্‌পিয়ান সাগরের অবস্থান মহাসাগরের চেয়েও ২৬ মিটার নিম্নে, আবার পামির পর্বতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাড়ে সাত হাজার মিটার উচ্চ স্থানও আছে। দেশের কোথায়ও বা বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ, আবার অন্যত্র সীমাহীন পার্বত্য প্রদেশ। দেশের আবহাওয়া কোথায়ও একান্ত শীতল, সেখানে হয়ত নিম্নতম তাপ —৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, আবার অন্য কোন অঞ্চলে হয়ত প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, উচ্চতম তাপ +৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। কারাকুম মরুভূমির চির অনাবৃষ্টি অঞ্চলের সঙ্গেই রহিয়াছে এমন স্থান যেখানে গ্রীষ্মে দৈনিক বৃষ্টিপাত হয়ত বা ৩৬ ইঞ্চি। দেশের ভিতরে দুই স্থানের সময়ের পার্থক্য ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত আছে। একই সময়ে কোথায়ও রাত্রি কোথায়ও দিন। কোন কোন জায়গায় দুর্গম অরণ্য রহিয়াছে, আবার

এমন স্থানও আছে যেখানে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সীমাহীন উন্মুক্ত প্রান্তর। কত বিচিত্র প্রাণী, কত বিবিধ উদ্ভিদ্—কত বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী—১৮৫টি জাতি। এত অনৈক্যের মধ্যেও গড়িয়া উঠিয়াছে একটা মহাজাতি—যাহারা একের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই বিরাট দেশের প্রকৃত খবর দেশবাসীরাই বা কতটুকু জানিত? এক অঞ্চলের সঙ্গে অপর অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল খুবই সামান্য। দেশের অভ্যন্তরে যেখানে সামান্য কৃষি বা শিল্প প্রচেষ্টা ছিল সেখানকার কথাই সকলে জানিত। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে যেখানে যাতায়াত সহজ ছিল, বিদেশের লোকেরা সেই সব সীমান্তের সঙ্গেই পরিচিত থাকিত। এতদ্ব্যতীত দূরবর্তী অঞ্চলগুলি ছিল ভূগোলের অজ্ঞাত দেশ। পাহাড়-পর্বত, অরণ্য ও মরুভূমি দেশের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যাহত করিত। ব্যবসায়ীর প্রয়োজনে ভূগোলের যেটুকু জ্ঞান দরকার তদতিরিক্ত কিছু শিক্ষায়তনে শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল না, ভূগোলের অর্থনৈতিক দিকটার কথা কেহ ভাবিতেই জানিত না। রাষ্ট্রের তথা দেশের সকল প্রয়োজনের মূলে ছিল দুইটি উদ্দেশ্য—সামরিক উপযোগিতা ও ব্যবসায়িক লাভালাভ। সুতরাং বিরাট রাশিয়ার বহু অঞ্চল সম্বন্ধেই রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। উত্তরের মেরু অঞ্চল, সাইবেরিয়া অঞ্চল, পামিরের পার্বত্যদেশ, কারাকুমের মরুভূমি—বিরাট রহস্যময় ভূখণ্ড বলিয়াই পরিচিত ছিল। কেহ জানিত না সেখানকার ভূপ্রকৃতি, সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের খবর। কোন কোনও দুঃসাহসিক অভিযানকারী হয়ত কখনও কোন অঞ্চলে অভিযান করিত, সে ছিল নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই সকল অভিযান একান্ত বিপদসংকুল ও ব্যয়বহুল

ছিল, সুতরাং ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে এবম্প্রকার অভিযানকে উৎসাহিত করিবার কোন হেতু ছিল না। নিজের দেশের সীমান্তের জ্ঞান সংগ্রহের চেয়ে তৎকালে পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যের সীমান্তে অভিযান করাই বেশী প্রয়োজনীয় মনে হইত, কারণ সেখানে ছিল সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণের প্রশ্ন। তাই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিপোষিত ভূগোলবিজ্ঞানবিদেরা সেই কার্যেই আত্মনিয়োগ করিতেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে লেনিনের সুদূর-প্রসারী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। দেশকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল করিতে না পারিলে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা স্বপ্নেই পর্যবসিত হইবে, লেনিনের দূরদৃষ্টি এই সত্যকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। এই অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতাকে বাস্তবী-করণের প্রথম সোপান দেশকে সমগ্ররূপে জানিয়া লওয়া ও দেশের কোথায় কোন সম্পদ রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা। লেনিনের নেতৃত্বে বিজ্ঞানীরা এই কার্যে নিয়োজিত হইলেন। দলে দলে লোক অভিযান সুরু করিল গহণ অরণ্যে, উত্তুঙ্গ পর্বতশিখরে, দুস্তর মরুপ্রদেশে, দুঃসহ শীতল মেরু অঞ্চলে। সাইবেরিয়ার জঙ্গলে, পামীরের পাহাড়ে, উত্তর সাগরের বরফাচ্ছাদিত ভূখণ্ডে প্রথম মানুষের পদচিহ্ন পড়িল। অতীতের সেই দুঃসাহসী অভিযান নবরূপে ও ব্যাপকভাবে পুনঃ প্রবর্তিত হইল। কিন্তু অতীতের অভিযানের সঙ্গে এই অভিযানের মৌলিক পার্থক্য আছে। অতীতের অভিযানকারীদের একমাত্র অবলম্বন ছিল দুঃসাহসিকতা, একান্তভাবে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াই তাহাদের চলিতে হইত। বর্তমান অভিযানকারীদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল

বিজ্ঞান তাহার অস্ত্রসম্ভার লইয়া, প্রকৃতির কুটিল ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া।

বিজ্ঞানের সাহায্যে তাই আজ দুর্গম স্থান সুগম হইয়াছে—নব নব দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূগোল-বিজ্ঞানবিদ্ আবিষ্কার করেন নূতন দেশ—তারপর সেখানে যান ভূতত্ত্ববিদ্ প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধানে। তারপর সেখানে গঠিত হয় নূতন শিল্প, নূতন জনপদ, নূতন সমাজ। বৎসরের পর বৎসর এমনি করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন বিজ্ঞানী-গোষ্ঠী, প্রকৃতির রহস্যঘন অঞ্চলে হানা দিয়া, নূতন সম্পদ আহরণ করিয়া বিশ্বমানবকে দিতেছেন বাঁচিবার রসদ, দারিদ্র্য ও নিপীড়ন হইতে মুক্তির উপায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই অজ্ঞাত দেশের সন্ধানকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। রাশিয়ার উত্তরাংশে রহিয়াছে উত্তর সাগর। ঐ মেরু অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কোন স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। এখানে প্রায় বারমাসই বরফ থাকে, তাই যাতায়াত সম্ভব ছিল না। সাইবেরিয়ার অরণ্যাঞ্চলও অজ্ঞাত দেশ ছিল। মরুভূমি অঞ্চলের খবরও কেহ রাখিত না। এতদ্ব্যতীত পার্বত্য প্রদেশগুলিও দুর্গম স্থান ছিল।

মেরু অঞ্চলের অভিযান প্রচেষ্টা জারের আমলে কিছু কিছু হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে তখন পিছু হটিতে হইয়াছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এক অভিযাত্রীদল চিলিয়াসখীন অন্তরীপের উত্তরে এক দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু শীতের প্রারম্ভেই তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের বর্ণনানুযায়ী ঐ অঞ্চলের একটা সৈকতরেখা অস্পষ্টভাবে মানচিত্রে দেখান হইত—কিন্তু ঐ স্থানের প্রকৃত খবর কেহ জানিত না।

সেখানে একটি ভূখণ্ড আছে মাত্র এইটুকু খবরই জানা ছিল—সে ভূখণ্ডের স্বরূপ সম্বন্ধে সবই ছিল অনুমান। জার শাসনতন্ত্র এই অভিযানকে উৎসাহিত করেন নাই। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'বরফ ভাঙা' জাহাজে করিয়া একদল অভিযাত্রী ঐ অঞ্চলে গমন করেন এবং দুইবৎসর কাল সেখানে অবস্থান করিয়া এক নূতন দেশের ভূগোল রচনা করেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহনাদির সাহায্যে তাঁহারা সেখানকার উদ্দাম প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়াছেন। রাশিয়া তথা পৃথিবীর মানচিত্রে ৪টি নূতন দ্বীপের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে যাহাদের আয়তন হলাণ্ড দেশের চেয়েও বড়। ইহাদের নামকরণ হইল অক্টোবর-বিপ্লব দ্বীপ, বলশেভিক দ্বীপ, তরুণ-কমুনিষ্ট দ্বীপ ও পায়োনীয়ার দ্বীপ। এই প্রকার উত্তর সাগর অঞ্চলে আরও অনেক দ্বীপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই উত্তরমেরু অভিযান এত ব্যাপকতা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রতি বৎসর এখানে নবতম অঞ্চলের সন্ধান করা হইতেছে। আবহাওয়াতত্ত্ব জানিবার জন্য নানা স্থানে বহু ঘাটি নির্মিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি বেতার স্টেশনও স্থাপিত হইয়াছে। মেরু অঞ্চলের আবহাওয়াতত্ত্ব সমগ্র রাশিয়ার আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দলে দলে বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত মেরুর দিকে আগাইয়া যাইতেছেন। এই সকল দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে খনিজ সম্পদের সন্ধান করা হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত অক্টোবর-বিপ্লব দ্বীপপুঞ্জে টিনের খনি পাওয়া গিয়াছে, নোভায়া জেমলিয়াতে পাওয়া গিয়াছে এস্‌বেসটোজ, তাইমির উপদ্বীপে তৈল ও অভ্রের সন্ধান মিলিয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের পর একদা-অজ্ঞাত দেশে এক্ষণে বিরাট জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

মেরু অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদলের অন্যতম প্রচেষ্টা হইয়াছে—উত্তর সাগরের ভিতর দিয়া প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরের যাতায়াত পন্থা আবিষ্কার করা। বহুকাল হইতেই নাবিক ও বিজ্ঞানীরা এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত ছিলেন। তিন ব্যক্তি এই বিষয়ে সফলকাম হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমুণ্ডসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা পূর্বোক্ত চলাচলের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বরফের জন্য সমগ্র শীতকালটা ইঁহাদিগকে পথিমধ্যে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই রকম পথের আবিষ্কার দ্বারা কোন বাস্তব সুবিধাই হইল না। উত্তর সাগরের সামুদ্রিক রাস্তা দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে যাওয়াকে বাস্তবরূপ দিবার জন্য সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা উদ্যোগী হইয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক স্মিথ সর্বপ্রথমে উত্তরসাগর পথে 'বরফ ভাঙা' জাহাজ 'সাইবেরিয়া কোভে' চড়িয়া অতলান্তিক মহাসাগর হইতে একটানা প্রশান্ত মহাসাগরে গমন করিলেন শীতকালটা পথিমধ্যে বিশ্রাম না করিয়া। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বরফ ভাঙা' জাহাজ 'লিটকে' প্রশান্ত মহাসাগর হইতে অতলান্তিক মহাসাগরে গিয়াছিল। এক্ষণে মেরু অঞ্চল দিয়া সমুদ্রপথে পশ্চিম হইতে পূর্বে যাতায়াত সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তবে এই জন্য দরকার স্থানে স্থানে বন্দর, বাতিঘর প্রভৃতি জাহাজ চলিবার সহায়ক ব্যবস্থা নির্মাণ করা। সোভিয়েট অর্থনৈতিক বিবর্ধন ব্যাপারে মেরু অঞ্চলের জয়যাত্রা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

সোভিয়েট জাগরণের পূর্ব পর্যন্ত কারাকুম ও কিজিল-কুম মরুভূমির কোন মানচিত্র জানা ছিল না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মোটরে চড়িয়া একদল অভিযাত্রী এই মরু প্রদেশের ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করেন।

মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের স্বরূপ এতাবৎকাল অজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে প্রতিবৎসর সোভিয়েট অভিযাত্রীদল এই সকল পার্বত্য প্রদেশে হানা দিয়া থাকেন এবং সেখানকার মানচিত্র অঙ্কিত করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে একদল বিজ্ঞানী পামীর পর্বতে অভিযান করেন। ক্রমাগত কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা এই পার্বত্য প্রদেশের ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে পামীর অঞ্চলে পর্বতের উপর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণমন্দির নির্মিত হইয়াছে। সেখানে প্রায় ১৫ হাজার ফুট উচ্চে একদল বিজ্ঞানী নিয়মিত ভাবে বাস করিয়া নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই পামীর অঞ্চলে অনেক খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সাহায্যে সমগ্র রাশিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। দেশের আয়তন ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়াছে। শুধু দেশের আয়তন বৃদ্ধি বা নূতন দেশে অভিযান কার্যেই এই পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ নহে। এই আবিষ্কারের পিছনে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নেই এই আবিষ্কারের সার্থকতা। নূতন দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে দেশের অনুন্নত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইবার পর সেখানকার জনগণের জীবনধারাকে নূতন উন্নত খাতে প্রবাহিত করান হয়, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল কার্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে একাডেমী অফ সায়েন্সেসের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থার জন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। বিজ্ঞান ও অর্থনীতির মিলনের ফলে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সম্প্রসারণ অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। এই

সম্প্রসারণের বিশেষত্ব এই যে ইহার সঙ্গে পরস্বাপহরণ, শোষণ, বঞ্চনা বা রক্তপাত নাই। এই অভিযানে সংগ্রাম আছে সত্যই, কিন্তু সে সংগ্রাম মানুষে মানুষে নয়, সবলের সঙ্গে দুর্বলের নয়, এই সংগ্রাম মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির। সোভিয়েট য়ুনিয়নের ক্রম বিস্তৃতির পিছনে যে ইতিহাস থাকিয়া যাইতেছে তাহা করুণ বঞ্চনার ইতিহাস নয়, তাহা মানুষকে মানুষের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বিচিত্র কাহিনী।

শিল্পের প্রসার

জারশাসিত রাশিয়া ছিল অতি দরিদ্র দেশ এবং প্রায় সর্বাংশে কৃষিপ্রধান। দেশের এই দারিদ্র্য বা শিল্পপ্রচেষ্টায় পরাঙ্মুখতা প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবজনিত নহে। তৎকালে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থায় দেশের সম্পদবৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা বা সুযোগ ছিল না। শাসনতন্ত্র পরিচালিত হইত স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিধানানুযায়ী। জনকল্যাণের চেয়ে ব্যক্তিগত সুবিধাই ছিল অধিকতর কাম্য। ধনতান্ত্রিক শোষণ ছিল সকল শিল্পপ্রচেষ্টার পরোক্ষ উদ্দেশ্য; তাই শিল্পসম্ভাবনার দিকটা উপেক্ষিত হইয়াই আসিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়ায় এই জাতীয় দারিদ্র্য শোচনীয়ভাবে প্রকটিত হইল। তদানীন্তন রাশিয়ায় দারিদ্র্য ও অভাবের পেষণে যে জনজাগরণের সূচনা হইল দেশনায়কগণ দেখিলেন সেই সমাজতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জনগণের দুর্দশা সর্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। এই দুরবস্থা দূরীকরণে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করণ অনেকাংশে সহায়তা করিয়া থাকিলেও উহাই রাশিয়ার আর্থিক উন্নয়নের সবটুকু নহে। দেশের তথাকথিত জমিদার বা জমির মালিকদের ভূসম্পত্তিকে সমভাগে ভাগ করিয়া দিয়াই গোটা দেশে রাতারাতি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা সম্ভব ছিল না, কেননা হাতে জমি পাইলেই কৃষক তাহাতে সোনা ফলাইয়া একটা বিরাট দেশের সর্বাঙ্গীন দারিদ্র্য মোচন করিতে পারিত না। দেশের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার দ্বারাই এই দুর্দশামোচন কার্যকরী করা

যাইবে লেনিন ইহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি আরও জানিতেন যে এই অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার মূলে রহিয়াছে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও উন্নত কৃষিব্যবস্থা—অপর দেশকে শোষণ করিয়া এই 'আত্মনির্ভরতা' লাভ করা সহজ নহে। দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই পাশাপাশি পুঁজিবাদী যে-সকল শত্রুভাবাপন্ন দেশ রহিয়াছে তাহাদের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব হইবে। এই প্রকারে বৈদেশিক শোষণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিলেই দেশে শিল্প ও কৃষিজাতদ্রব্যের প্রাচুর্য আনয়ন করা যাইবে এবং দুর্দশা ও দারিদ্র্য তখন দেশ হইতে নিশ্চিত বিলুপ্ত হইবে। জনগণের মুখের অন্ন যোগাইতে না পারিলে কোন আন্দোলনই সম্ভবপর নয় বুঝিতে পারিয়াই লেনিন সর্বাগ্রে এই দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। লেনিনের বৈপ্লবিক আন্দোলনে কেবল শূন্যগর্ভ আবেগ ছিল না। সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাকে সাম্যবাদের পুরোভাগে স্থান না দিলে সোভিয়েট রাশিয়ার গণজাগরণ বুদ্বুদেই মিলাইয়া যাইত।

নবজাগরণের পূর্বে রাশিয়ার শাসনতন্ত্র দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কোন খোঁজখবর রাখিত না। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই এই অজ্ঞতার স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। তৎকালে রাস্তা পাকা করিবার জন্য গ্র্যানাইট পাথর আনা হইত সুইডেন হইতে, জার্মানী দিত মাটির ও কাচের বাসন তৈয়ারী করিবার কাদা বালি। এলুমিনিয়ম, নিকেল, ভাল ইস্পাত, ক্যালসিয়ম কারবাইড প্রভৃতি শিল্পের কোন কারখানাই ছিল না। ভারী কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি প্রায় সবই বিদেশ হইতে আসিত। খনির কার্য ছিল বিদেশী বণিকের হস্তগত। এবম্প্রকার রাশিয়ার দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে—সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের

তখন কেবল সূচনা। দেশের সীমান্তে শত্রু, দেশের অভ্যন্তরে শিল্পপ্রচেষ্টা সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহাও প্রায় অচলাবস্থায়। বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন তদানীন্তন সোভিয়েট রাশিয়ার এই একান্ত সংকটের দিনে লেনিনের বৈজ্ঞানিক তথা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জাতিকে দিল নব অনুপ্রেরণা ও বাঁচিবার উপায়।

শিল্পগঠনে প্রাথমিক প্রয়োজন কাঁচা মাল, ইন্ধন, যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক পদার্থাবলী। লেনিনের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানিগণ এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহাদের সকলের মূলমন্ত্র হইল, দেশকে জানিতে হইবে, দেশের সম্পদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। একাডেমী অফ সায়েন্সেসের অধীন বহু ছোট বড় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিজ্ঞানিগণ এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত হইলেন।

শিল্পপ্রচেষ্টাকে সফল করিতে সর্বাগ্রে দেশময় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য লেনিন দুইশত বিজ্ঞানীকে কার্যভার দিলেন। লেনিনের এই পরিকল্পনা এত ব্যাপক ছিল যে উহার সাফল্যে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ, জি, ওয়েলস তৎকালে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে আলোচনা করিবার পর তিনি লেনিনকে 'স্বপ্নবিলাসী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ওয়েলস ভাবিয়াছিলেন তৎকালীন রাশিয়ার ন্যায় দরিদ্র ও রণবিধ্বস্ত দেশের পক্ষে এই বিরাট পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব নহে। লেনিন ওয়েলসকে দশ বৎসর পরে রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। লেনিনের পরিকল্পনা সত্যই এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে বিদেশী মূলধনের সাহায্য ব্যতীত এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে না একথা বৈদেশিক পুঁজিপতিরা

স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু লেনিনের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ তাঁহার 'স্বপ্ন'কেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই সমগ্র রাশিয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০ গুণ বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ব্যাপক বিদ্যুতীকরণ ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার মূলে বিপুল আর্থিক ভিত্তি ছিল না, ছিল অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও সাফল্য। এইজন্য বহু বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে। সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হইয়াছিল ইন্ধন সংগ্রহের। যেখানে যে-প্রকার ইন্ধন সহজলভ্য হইয়াছে কাঠ, কয়লা বা তৈল তাহাই যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। বাত্যাশক্তি, সৌরশক্তি, জলস্রোতশক্তি কোনটাই উপেক্ষিত হয় নাই। উত্তরাঞ্চলে 'পীট' ইন্ধনের কার্য করে। মস্কো অঞ্চলে 'বাদামী কয়লা'য় ডায়নামো চালান হয়। একথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই জাতীয় কয়লাকে ইতিপূর্বে একরূপ অব্যবহার্যই মনে করা হইত। ডনবাসে কয়লার গুঁড়াকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হয়। বাকুতে পেট্রোলিয়ম গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এইরূপে ভাল কয়লা, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতিকে অন্য লাভজনক কার্যে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যে-সকল নিকৃষ্ট জাতীয় ইন্ধন দ্বারা কোন শিল্পকার্য চালান সম্ভব ছিল না সেইগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে নিয়োজিত করা হইতেছে এবং উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা শিল্প-কারখানা চালান হইতেছে। এই সাফল্যের জন্য যেসব অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না সেখানেও শিল্প-কারখানা গঠিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক

সম্পদে দরিদ্র অঞ্চলও এইরূপে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

জলস্রোতকে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে বিজ্ঞান প্রায় অসাধ্য সাধন করিয়াছে। এঞ্জিনিয়ারীং কার্যে অভূতপূর্ব নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। পর্বতোপরি যে-সকল হ্রদে জল জমিয়া থাকে সেই জল বিরাট শক্তির আধার। আরমেনিয়া পর্বতে সেভ়ান হ্রদের আয়তন ১৪০০ বর্গ কিলোমিটার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ২ কিলোমিটার (প্রায় ১$\frac{১}{৪}$ মাইল)। ৩৪টি ছোট বড় নদী ও খাল এই হ্রদে জল সরবরাহ করে এবং মাত্র একটি ক্ষুদ্র নদীপথে যে জল বাহির হইয়া আসে তাহার ৪০গুণ জল বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়। শক্তির উৎস হিসাবে জলের এই বাষ্পীভবন সম্পূর্ণ অপচয়। সেভান হ্রদের নিকটবর্তী ট্রান্সককেশাস অঞ্চলে শিল্প পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি দরকার—অথচ সেখানেই প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ ঘন মিটার জল হাওয়ায় মিশিয়া যাইতেছে। এই পরিমাণ জলকে স্রোতাকারে প্রবাহিত করিতে পারিলে কি বিরাট শক্তিই না পাওয়া যাইতে পারে! সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা শক্তির এই অপচয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেভান হ্রদের জলকে পাম্পের সাহায্যে নীচে চালিত করিয়া কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করা হইতেছে। এই জলপ্রপাতে ৯টি বৈদ্যুতিক উৎপাদন যন্ত্র চালান যাইবে। হ্রদের জল উপত্যকা অঞ্চলে চলিয়া যাইবার পথে সেখানে তুলা ও দ্রাক্ষা ক্ষেত্রকে সরস করিয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক শক্তির এমনি সদ্ব্যবহার করিয়াই রাশিয়ার জনগণ সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

ভলগা নদী য়ুরোপের দীর্ঘতম নদী, কিন্তু এই বিরাট নদীর এমন স্রোত নাই যাহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে, যদিও ভলগা অনেকগুলি শিল্পকেন্দ্রের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের কার্যকুশলতায় শান্ত ও মন্থর ভলগাতেও উদ্দাম জলপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে হইবে। নদীর ভিতরে বাঁধ দিয়া জলের গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভলগাতে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে।

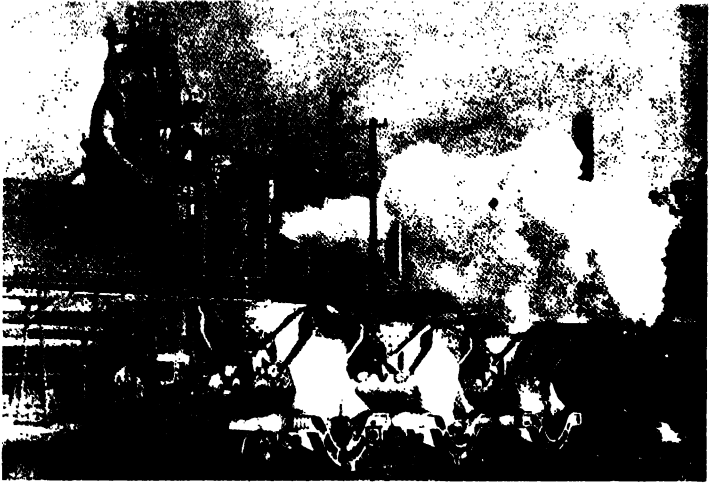
এইভাবে নানা উপায়ে দেশের যত্রতত্র বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ফলে শিল্পোন্নয়ন কার্য দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। অতীতের সেই বাষ্পশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্প এত উন্নত হইতে পারিত না। বৈদ্যুতিক শক্তি সহজে দূরান্তরে প্রেরণ করা যায়, ইহার ব্যবহার সর্বকার্যে সম্ভব, ইহাতে খরচ কম। রাশিয়ার মত দরিদ্র দেশের পক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য না পাইলে সোভিয়েটের সমৃদ্ধি হয়ত বা স্বপ্নই থাকিত। লেনিন বলেন—সোভিয়েটের শক্তি ও দেশব্যাপী বিদ্যুতীকরণ ইহাই কম্যুনিজমের সবটুকু। (Communism is the Soviet power plus electrification of the whole country)। কথাটি সর্বাংশে সত্য। সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য তার ও খাম্বা অতি সাধারণ দৃশ্য। সারা দেশের মাথার উপরে তারের পর তার ঝুলিতেছে। অন্যান্য দেশে ধনিকের অর্থে যে শিল্প গড়িয়া উঠে বিপুল অর্থব্যয়ে, তৎকালীন দরিদ্র রাশিয়ায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বিজ্ঞানের সহায়তায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

(শতকরা হিসাব)

কি দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে	১৯১৩	১৯৩৪
পেট্রোলিয়ম	৬০	১৪.৫
আমদানী করা কয়লা	৪০	১৩.৩
পীট	——	১৮.৭
স্থানীয় কয়লা	——	৩৭.০
অন্যান্য জ্বালানী	——	২.৪
জলস্রোত	——	১৪.১
	১০০	১০০

শিল্পোন্নয়ন দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও সেগুলিকে ব্যবহারে প্রয়োগ করা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় শিল্পকার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের একটি তালিকা তৈয়ারী হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে বিবিধ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থের ভিতর মাত্র ১৪টি রাশিয়ায় পাওয়া সম্ভব। তন্মধ্যে মাত্র ৪টি প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং ৬টির পরিমাণ ছিল খুবই স্বল্প। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি হিসাব তৈয়ারী হইয়াছিল তাহাতে মাত্র ৩০টি মৌলিক পদার্থের খনিজ প্রস্তর রাশিয়ায় পাওয়া যায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ত্রিশটিরও সন্ধান ভাল জানা ছিল না। হিলিয়ম, পটাসিয়ম, নিকেল, কোবলট, এই পদার্থগুলি শিল্পকার্যের চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যাইত না। জারের সময়ে খনিজ-শিল্প সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের অধীন ছিল। এইরূপ শিল্পকেন্দ্রের সংখ্যাও সারা দেশে তিন চারিটির বেশী ছিল না। দেশে ভূতাত্ত্বিকের সংখ্যা ছিল নগণ্য, ভূতত্ত্ব শিখাইবার কোন



সোভিয়েট দেশের একটি আধুনিক লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা



শারীর বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণারত একজন সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক।

প্রতিষ্ঠানও ছিল না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এতদ্বিষয়ে প্রথম কার্য ছিল একদল সুশিক্ষিত কর্মী গড়িয়া তোলা। প্রথমেই এইজন্য বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সহস্রাধিক যুবক এই বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া এই শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদল দেশের খনিজ সম্পদের সন্ধান ও সেইগুলিকে ব্যবহারোপযোগী করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবনে ব্রতী হইলেন। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধনে খনিজ পদার্থানুসন্ধানবিষয়ক কার্যাবলী দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রাক্-সোভিয়েট রাশিয়ায় ভূমির মালিকের অনুমতি ও খেয়াল অনুযায়ী চলিতে হইত বলিয়া ভূতত্ত্ববিদের সন্ধানকার্য পদে পদে ব্যাহত হইত।

সোভিয়েট শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর রাশিয়ায় বহু খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শুধু নবাবিষ্কৃত অঞ্চলেই নহে—পুরাতন রাশিয়ার নানাস্থানেও খনিজ পদার্থ আছে বলিয়া নূতন করিয়া জানা যাইতেছে। রাশিয়া খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও এতদ্বিষয়ে দেশের লোকের কোন ধারণা বা জ্ঞান ছিল না। যে দেশের মাটির বুকে রাশিয়ার লোকেরা বাস করিত, সেই মাটির নীচেই এত সম্পদ রহিয়াছে—কে তাহার খবর জানিত!

ইতিমধ্যে কয়লার যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে পূর্বাপেক্ষা রাশিয়ার কয়লার পুঁজি পাঁচগুণ বাড়িয়াছে তেমনি সন্ধান মিলিয়াছে পেট্রোলিয়মের। পূর্বে যে-সব অঞ্চলে তৈলের খনি নাই বলিয়াই জানা ছিল সে-সব স্থানেও নূতন করিয়া অনুসন্ধান করার ফলে খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন এলাকাতে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইতেছে।

এমন অঞ্চল হয়ত আছে যেখানে শিল্পকার্যের জন্য তৈলের প্রয়োজন, অথচ সেখানে কোন খনির অস্তিত্ব ইতিপূর্বে জানা ছিল না। গভীর অনুসন্ধানকার্যের ফলে সেই অঞ্চলে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি ইতিপূর্বে যে-সব অঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া তৈল পাওয়া যায় নাই বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল সেই সকল স্থানেও প্রচুর তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টা ও নব নব পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইহারই ফলে এখন রাশিয়ার প্রায় সকল অঞ্চলেই তৈলের খনি পাওয়া গিয়াছে। ইউরাল পর্বতে, মরুপ্রদেশে, ককেশাস অঞ্চলে, পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে তৈলের সন্ধান মিলিয়াছে। এই সকল আবিষ্কারে শিল্পপ্রচেষ্টার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তৈলের খনি আবিষ্কারের পিছনে রহিয়াছে সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক অভিযান। তৈলের খনিতে বিদ্যুতের ব্যবহারে রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য।

লৌহসম্পদের যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা পূর্বতন রাশিয়ার লৌহ সম্পদের ১৩০ গুণ। এই আবিষ্কারের প্রত্যেকটি অসামান্য বৈজ্ঞানিক সাফল্যের নিদর্শন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের বহু পূর্ব হইতেই এটা পরিলক্ষিত হইয়াছে যে কুরস্ক অঞ্চলে কম্পাসের চৌম্বক শলাকা বিচলিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই হয় যে ঐ প্রদেশে কোথায়ও বড় লৌহের খনি আছে। লিস্ট নামক বিজ্ঞানী এই খনির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার একার সামর্থ্যই বা কতটুকু ছিল! তিনি খনির নিশানা করিতে পারেন নাই। তদানীন্তন রাষ্ট্রের অধীন বিজ্ঞানবিভাগ কুরস্কের লৌহখনিকে অলীক কল্পনা মাত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া কর্তব্য শেষ করেন। লেনিন একদল বিজ্ঞানীকে এই অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

করিতে প্রেরণ করিলেন, তখনও রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ শেষ হয় নাই। সেই রণতাণ্ডবের মধ্যেই বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান: চলিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬০ মিটার ভূনিম্নে খুব বড় এবং সমৃদ্ধ একটি খনির সন্ধান পাওয়া গেল।

পশ্চিম সাইবেরিয়ার কুজনেটজ্‌ক অঞ্চলের কয়লা হইতে ভাল কোক তৈয়ারী হয়। খনিজ প্রস্তর হইতে লৌহ-নিষ্কাশন কার্যে কোকের প্রয়োজন আছে। এখানকার কোক কাজে লাগাইবার জন্য ১২৫০ মাইল দূরবর্তী উরাল পর্বত হইতে লৌহপ্রস্তর আনিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভূতাত্ত্বিকগণ চেষ্টিত হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাদের চেষ্টা সাফল্যলাভ করিল, পশ্চিম সাইবেরিয়ায় লৌহ-খনি পাওয়া গেল।

পূর্বতন রাশিয়ায় বিজ্ঞানীমহলে ধারণা ছিল যে দেশের পূর্বাঞ্চলে লৌহসম্পদ কম। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। শুধু নূতন খনি আবিষ্কারই সোভিয়েট ভূতাত্ত্বিকের কৃতিত্ব নয়, পুরাতন খনিরও নূতন পরিমাপ করিয়া তাহার সম্পদ বিষয়ে নূতন জ্ঞান সংগৃহীত হইয়াছে।

লৌহ ভিন্ন অন্যান্য খনিজপদার্থেরও যথেষ্ট সন্ধান জানা যাইতেছে। ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া গিয়াছে পূর্বেকার চার গুণ, তাম্র পাওয়া গিয়াছে প্রায় ৩০ গুণ, সীসা ও দস্তা ৮ গুণ। অ্যালুমিনিয়ম ও নিকেলের খনি রাশিয়ায় সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। মেরুপ্রদেশে কোলা উপত্যকায় খিবিন নামক এক পার্বত্য স্থান আছে। রাশিয়ার পূর্বতন মানচিত্রে ঐ স্থানের কোন পরিচয় নির্দেশ করা হইত না। সেখানে এপেটাইট ও নেফেলীনের প্রচুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এপেটাইট হইতে ফসফেট উদ্ধার করা হইয়া থাকে। নেফেলীন খুব মুল্যবান পদার্থ,

প্রায় বিশ রকম প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়; তন্মধ্যে অ্যালুমিনিয়ম, কাচ, সার পদার্থ এবং ট্যানিন তৈয়ারীর কাজ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত খিবিন পর্বতে বহু দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়াছে যেগুলির প্রায় ৪০টি ইতিমধ্যেই শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। খিবিন পর্বতের খনিজ পদার্থের সন্ধান দিবার জন্য সকল প্রশংসা অধ্যাপক ফার্সম্যান ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রাপ্য। ফার্সম্যান অক্লান্তকর্মী —তিনি রাশিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন এবং প্রত্যেকবারই ভ্রমণশেষে রাশি রাশি খনিজপদার্থের সন্ধান জানাইতেছেন।

একদা রাশিয়ায় জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত পটাসিয়মঘটিত খনিজ পদার্থের একান্ত অভাব ছিল। বর্তমানে সোভিয়েট য়ুনিয়নের পটাসিয়ম সম্পদ পৃথিবীর অন্যত্র যে-পরিমাণ পটাসিয়ম পাওয়া যায় তাহার ৩৫ গুণ বেশী এবং ইউরাল পর্বতের উত্তরাংশে অবস্থিত সোলিকামস্‌কে যে-পরিমাণ পটাসিয়মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে— শুধু তাহা দ্বারাই সমগ্র পৃথিবীর কয়েক হাজার বৎসরের প্রয়োজন মিটিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত বহু স্থানে স্বর্ণ, হিলিয়ম, কোবল্ট, এন্টিমনি, টিন, মলিব্‌ডেনাম, গন্ধক, রেডিয়ম প্রভৃতিরও অনেক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে ৯২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে রাশিয়ায় ৩০টির বেশীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ভরসা করেন অচিরকালমধ্যেই তাঁহারা সকল প্রকার পদার্থকেই দেশের মাটি হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। ইহা হয়ত মোটেই অসম্ভব নহে। যদিও ইতিমধ্যেই ৭৫০০০ সংখ্যক কেন্দ্রে খনিজ-পদার্থ সংগ্রহ কার্য চলিতেছে তবুও সমগ্র রাশিয়ার দুইতৃতীয়াংশ

স্থানে ভূতাত্ত্বিক সন্ধান বাকীই রহিয়াছে। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক গবেষণা এত বেশী ফলপ্রদ হইয়াছে যে বর্তমানে রাশিয়াকে কোন খনিজ পদার্থের জন্যই অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের পরিকল্পনায় যখন এই সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হইয়াছিল তখন ইহাকে একটা অবাস্তব স্বপ্ন বলিয়াই মনে করা হইত এবং তাহা করিবার কারণও হয়ত ইহাই ছিল যে তদানীন্তন রাশিয়া প্রায় সর্বপ্রকার কাঁচামালের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিত এবং দেশের পুঁজিবাদী শাসনতন্ত্র ও বিদেশের ধনিক শোষণযন্ত্র এই কথাই প্রচার করিত যে রাশিয়াকে কৃষিপ্রধান দেশ হইয়াই থাকিতে হইবে।

সোভিয়েট ভূতাত্ত্বিক গবেষণাকার্য চালাইবার জন্য অর্থনৈতিক বিভাগে রাষ্ট্রের অধীনে এক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (The chief Geologo-hydro-geodesic administration) আছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অধীনে ছয় হাজার ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ এবং এক লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে সহস্র সহস্র কর্মী কার্য করিতেছেন। সকল সন্ধান কার্যই নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নব নব পদ্ধতিতে (Magnetometry, Graimetry, Seismometry, Radiometry)—অনুসন্ধান কার্য করা হইতেছে। চুম্বক, মাধ্যাকর্ষণ, ভূমিকম্পের তরঙ্গ, বিদ্যুৎতরঙ্গ এই সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের সাহায্যে ভূগর্ভের স্বরূপ জানিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এমন কি এইরূপে কোন কোন খনিজ পদার্থের অবস্থান গণনা দ্বারাও নির্ণয় করা হইয়া থাকে। পামীর পর্বতের টিন, ইউরাল পর্বতের লৌহেতর ধাতব পদার্থের

আবিষ্কার এই প্রকারেই হইয়াছিল। বহুস্থানে একাডেমী অফ সায়েন্সেসের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নেতৃত্বে প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক ভূতাত্ত্বিক অভিযান পরিচালিত হয়। এই সন্ধানকার্য চালাইবার জন্য একাডেমী অফ সায়েন্সেসের এক বিশেষ শাখা আছে (Council for the study of Natural Resources)। পূর্বোক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (Chief Geologo-hydro-geodesic administration) ও এই প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা গাবকিন একদা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক, বর্তমানে তিনি খনিজপদার্থ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে জগদ্বিখ্যাত। সোভিয়েট রাশিয়ার খনিজসম্পদ বিবর্ধনের সঙ্গে তাঁহার নাম চিরজড়িত রহিবে। সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্প উন্নয়নে একাডেমী অফ সায়েন্সেসের প্রচুর দান আছে। মধ্য এশিয়াকে একদা খনিজসম্পদশূন্য বলিয়া মনে করা হইত। এক্ষণে একাডেমীর চেষ্টায় সেখানে প্রচুর লৌহেতর ধাতব পদার্থ ও রাসায়নিক কাঁচা মাল পাওয়া যায়। ক্রিমিয়ার আয়োডিন, ব্রোমিন প্রভৃতি শিল্পের গোড়াপত্তনে একাডেমীর কৃতিত্ব রহিয়াছে।

বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সম্মিলিত উদ্যোগে সোভিয়েট রাশিয়া মাটির নীচে এক নূতন দেশের সন্ধান পাইয়াছে, সেখানে অফুরন্ত সম্পদ রহিয়াছে। ইহারই ফলে সোভিয়েট রাশিয়া আজ লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, স্বর্ণ, তৈল, ফসফরাস, পটাসিয়ম, পীট প্রভৃতি খনিজসম্পদে পৃথিবীতে প্রথমস্থান ও কয়লার মালিক হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীতে সন্ধান প্রাপ্ত লৌহের ৫২ %, ম্যাঙ্গানীজের ৭৩'৪%, পীটের ৭২'৭% ও পটাসিয়মের ৮৩%, খনিজ তৈলের ৩২'১%, তাম্রের ১৪'৪%, ফসফরাস ও এপেটাইটের ৬২% সোভিয়েট রাশিয়ায় রহিয়াছে।

একদল বিজ্ঞানী যেমন খনিজ সম্পদের সন্ধান দিতেছেন, অপরদল আবার নিয়োজিত রহিয়াছেন সেগুলিকে উদ্ধার ও প্রয়োজনে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে। এই সকল খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের পাশাপাশি বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। জারের আমলের রাশিয়া অপেক্ষা শিল্পসম্পদে ইংলণ্ড চারগুণ, জার্মানী পাঁচগুণ ও আমেরিকা দশগুণ সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সোভিয়েট দেশের চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। শিল্পসমৃদ্ধিতে বর্তমানে রাশিয়া য়ুরোপে সকলের উপরে স্থান পাইবে। পুরোপুরি কৃষিনির্ভর অবস্থা হইতে রাশিয়া সমগ্রভাবে শিল্পসমৃদ্ধ ও অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীল দেশে উন্নত হইয়াছে। এই অবস্থায় উন্নীত হইতে সোভিয়েটকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে, অনেক নূতন শিল্পপদ্ধতি উদ্ভাবন ও আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। অর্থনৈতিক সুবিধার উপর লক্ষ্য রাখিয়া নূতন পদ্ধতিতে শিল্পকারখানা নির্মাণ করিবার জন্য শিক্ষালাভার্থে বহুসংখ্যক সোভিয়েট যুবককে বিদেশে পাঠান হইয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। দুই একটি উদাহরণ দিলে এই সাফল্যের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশে সংগৃহীত কয়লার পরিমাণ ৪½ গুণ বর্ধিত হইয়াছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির হেতু শুধু নূতন খনি আবিষ্কারই নয়, ইহার মূলে রহিয়াছে খনি হইতে কয়লা উত্তোলন বা উদ্ধার করিবার নব নব পন্থা। সোভিয়েট রাশিয়ায় কয়লা তুলিবার ব্যবস্থা এখন প্রায় সর্বত্রই যন্ত্রচালিত। উপরন্তু কয়লাকে মাটির নীচেই গ্যাসে পরিণত করিয়া উহাকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা সোভিয়েট রাশিয়ার একক বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক অসামান্য উদ্ভাবনীর অন্যতম নিদর্শন। কয়লাকে আবদ্ধ

অবস্থায় তাপ সংযোগে গ্যাসে পরিণত করিয়া উহাকে আলো ও উত্তাপ যোগাইবার কাজে লাগান চলে। কয়লাকে খনি হইতে কঠিন আকারে তুলিয়া না লইয়া মাটির নীচেই গ্যাসে পরিণত করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। ইহাতে মানুষের কষ্টের লাঘব হয়, কয়লার অপচয় কমে। সোভিয়েট রাশিয়ার কোন কোন স্থানে এখন এই পদ্ধতিতে কয়লাকে কাজে লাগান হইতেছে। খনির ভিতরে একটা অংশ পৃথক করিয়া লইয়া তাহার দুই পার্শ্বে উপর হইতে দুইটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া দেওয়া হয়। এই সুড়ঙ্গদ্বয়কে যোগ করিয়া নীচে থাকে আরও একটি রন্ধ্রপথ। এই রন্ধ্রপথে দাহ্য পদার্থ রাখিয়া দেওয়া হয় যাহার সাহায্যে কয়লাকে উত্তপ্ত করা হয়। খনির এই অংশ বাকী অংশ হইতে অদাহ্য পদার্থের দেওয়াল দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে আগুন সর্বত্র ছড়াইয়া না যায়। এই সব ব্যবস্থা করিবার পর উপর হইতে নীচের দাহ্য পদার্থে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং উপরের রন্ধ্রপথে বাতাস চালাইয়া দিলে তাপ ও বাতাসের ক্রিয়ায় কয়লার উপাদান গ্যাসের আকারে দ্বিতীয় রন্ধ্রপথে বাহির হইয়া আসে। বর্তমানে প্রচলিত কোন পদ্ধতিতেই ভূগর্ভের কয়লার সকটুকু উঠাইয়া আনা সম্ভব নয়—খনির কয়লার প্রায় এক তৃতীয়াংশ নীচে ফেলিয়া আসিতে হয়। কিন্তু গ্যাসের আকারে তুলিলে কয়লার শেষ কণিকাটুকু বাহিরে আনা সম্ভব হইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। গ্যাস খনি হইতেই একেবারে কারখানায় প্রেরণ করা সম্ভব। ইহাতে শিল্পের প্রসারণে সাহায্য হইতেছে। কয়লা উত্তোলনকার্যে শ্রমিকের খাটুনি ও ঝুকি কমিয়াছে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন এইরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে যথাসম্ভব আরাম দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

কয়লার মতনই খনিজ তৈল উত্তোলন ব্যাপারেও নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। অল্পসময়ে গভীরতম রন্ধ্র নির্মাণ ও পরিত্যক্ত তৈলখনি হইতে পুনরায় তৈলোদ্ধার এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নূতনতম বিশোধন প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় যন্ত্রাদির ইন্ধন হিসাবে তৈলের উপযোগিতা বাধিত হইয়াছে।

খনিতে প্রাপ্ত কয়লা এবং তৈলের হিসাব

বৎসর	কয়লা (লক্ষ টন)	খনিজ তৈল (লক্ষ টন)
১৯১৩	২৯১	৯২
১৯২০	৮৬	৩৮
১৯২৭-২৮	৩৫৫	১১৭
১৯৩২	৬৪৪	২২৩
১৯৩৫	১০৮৯	২৬৮
১৯৩৭ (পরিকল্পনা)	১৫২৫	৪৬৮

খনিজ প্রস্তর হইতে ধাতব পদার্থের উদ্ধারকার্যেও অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় মিলিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ৪ হইতে ৬ টন খনিজ প্রস্তর হইতে ১ গ্রাম পরিমিত রেডিয়ম উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যে-সকল প্রস্তরে ইহা অপেক্ষাও কম অনুপাতে রেডিয়ম আছে সেইসব পদার্থ হইতে রেডিয়ম সংগ্রহকার্য অন্যত্র ব্যয়-বহুল ও অসম্ভব বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। রাশিয়ার কর্মিগণ ২৫০০০০ টন প্রস্তর হইতে ১ গ্রাম রেডিয়ম উদ্ধার করিতে সক্ষম, অথচ ইহার অর্থনৈতিক দিকটাও সেখানে উপেক্ষিত

হয় নাই। এই প্রকার পদ্ধতিতে প্রাপ্ত রেডিয়মের উদ্ধার-খরচও মোটেই বেশী হইতেছে না।

খনিজ সম্পদ উদ্ধার করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অর্থকরী ব্যবহারও আবিষ্কৃত হইতেছে। এতদ্বিষয়ে নিত্য নূতন গবেষণার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইতেছে। লৌহ ও অ্যালুমিনিয়মের ব্যবহারের কথা বাদ দিলেও সোভিয়েট রাসায়নিকদের কৃতিত্বে তথাকথিত অকেজো ধাতুদ্বারা যে নূতন নূতন মিশ্রধাতু নির্মিত হইতেছে তাহাদের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ অভিনব। টাঙস্টেন, বেরিলিয়ম, টাইটেনিয়ম, ট্যানট্যালাম, রুবিডিয়ম, সিজিয়ম প্রভৃতি ধাতুকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তোলা সোভিয়েট শিল্পের অন্যতম কৃতিত্ব। প্রকৃতির কোন সম্পদকেই বর্জনীয় মনে না করা ও সামান্য জিনিষকেও অর্থকরী ব্যবহারে নিয়োগ, ইহাই সোভিয়েট শিল্পের লক্ষ্য। তাই সেখানে নানাপ্রকার নূতন শিল্প, নূতন কারখানা, নূতন দ্রব্য নব নব ব্যবস্থায় নির্মিত হইতেছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থনীতির অঙ্গাঙ্গী সংযোগ সংঘটিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিবিড় সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে। এপেটাইট নামক খনিজ প্রস্তর হইতে ফসফেট সার সংগৃহীত হইয়া থাকে। ফসফেট সংগ্রহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে এলুমিনিয়ম উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে এবং তৎপর যে আবর্জনা (?) পদার্থ থাকে তাহা হইতে লৌহ, টাইটেনিয়ম ও ভ্যানেডিয়ম মিশ্রিত একটি মূল্যবান মিশ্রধাতু তৈয়ারী করা হইয়াছে।

জারশাসিত রাশিয়ায় দেশের শিল্প মাত্র গোটা কয়েক স্থানে গড়িয়া উঠিতেছিল। দেশের একপ্রান্তে হয়ত শিল্পাঞ্চল ছিল; অপর প্রান্তে কোন প্রকার শিল্পকারখানা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ধাতু,

রাসায়নিক ও বয়নশিল্প সমগ্রভাবে মস্কৌ, লেনিনগ্রাড, আইভানোভ ও গোর্কী প্রদেশের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিরাট দেশের বাকী সমগ্র অঞ্চল ছিল একান্তভাবে কৃষিপ্রধান। ইহারাই সরবরাহ করিত শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল। রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে এই ব্যাপার বড় কম বাধা হয় নাই। এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতে প্রায়শই কাঁচামাল পাওয়া যাইত না। যেমন লেনিনগ্রাড বা মস্কৌতে কয়লা মোটেই পাওয়া যাইত না। শিল্পাঞ্চল বাদ দিলে দেশের বাকী অংশের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। এই সব স্থান হইতে সস্তায় কাঁচামাল খরিদ করা হইত। তৈয়ারী মাল আবার সেখানে ফিরিয়া আসিত চড়া দামে বিক্রী হইবার জন্য। বহুদূর হইতে মাল চলাচলের খরচা বহন করিতে হইত দরিদ্র কৃষকগণকে। সহস্র-মাইল-ব্যাপী বিরাট দেশের সর্বত্র দারিদ্র্য ও দুর্দশা। শিল্পাঞ্চল বা নগর হইতে দূরে, বহু দূরে ছিল দেশের জনগণ, তাহাদের না ছিল শিক্ষা, না ছিল অন্ন —তারা ছিল ভিক্ষুক, মেষপালক বা বুনো শিকারীর দল।

লেনিনের পরিকল্পনার অন্যতম করণীয় বিষয় ছিল শিল্পকে দেশময় সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া। যেখানে যে প্রকার কাঁচামাল পাওয়া যাইবে ও যাহাতে শ্রমের অপচয় সর্বাপেক্ষা কম হইবে তদনুযায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠা করা। এই অর্থনৈতিক সত্যকে অনুসরণ করিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা শিল্পগঠনে ব্রতী হইলেন। নূতন কারখানা এমন ভাবেই স্থাপিত হইল যাহাতে কাঁচামাল ও তাহা কাজে লাগাইবার কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দূরত্ব না থাকে। ইহারই ফলে মধ্য এশিয়া, ট্রান্সককেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল দ্রুত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। গ্রামাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল। নিছক কৃষিপ্রধান

স্থান বলিয়া কোন জায়গা এখন আর সোভিয়েট রাশিয়ায় পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই পরিবর্তন খুব সহজে সম্ভব হয় নাই। শিল্পপ্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রত্যেকটি অঞ্চলের খনিজ সম্পদ ও কাঁচামালকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে, সেই দেশের প্রাপ্ত ইন্ধনকে কারখানা চালাইবার উপযুক্ত করিয়া লইতে হইয়াছে। এখানে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞেরা অর্থনীতিবিদ্‌কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। গ্রামাঞ্চলের শিল্পসমস্যাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া সেইগুলির প্রত্যেকটির সমাধান করিতে হইয়াছে।

যন্ত্রাদিনির্মাণে রাশিয়া খুবই অনগ্রসর ছিল। এমন কি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত সামান্য যন্ত্রগুলিও বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। কাস্তেখানি পর্যন্ত অষ্ট্রিয়া সরবরাহ না করিলে শস্যকাটা বন্ধ থাকিত। দেশে জাহাজ তৈয়ারীর ব্যবস্থা ছিল বটে, তবে প্রত্যেকটি অংশই তৈয়ারী হইয়া বিদেশ হইতে আসিত। সেগুলি কেবল একত্র করিয়া জুড়িয়া লওয়া ছিল দেশের কারখানার কাজ। এমনি অবস্থা ছিল প্রায় সকল যন্ত্রাদিরই। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এখন রাশিয়ায় জাহাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতম যন্ত্রটি পর্যন্ত তৈয়ারী হয়। অতীতে যেগুলি কৃষি অঞ্চল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এখন সেখানে বিরাট যন্ত্রাদি তৈয়ারী হইতেছে। খারকোর্ভ একদা ব্যবসায়ী ও জোতদারের স্থান ছিল, কিন্তু এখন সেই শহরে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের বাস। শস্যবহুল ইউক্রেন অঞ্চলে নিয়ত লৌহ গালাইবার চুল্লী হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। যন্ত্রনির্মাণ-কারখানা প্রতিষ্ঠার মধ্যে কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলেই এইগুলি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যাহার ফলে তদ্দেশের জীবনধারা উন্নত হইতেছে। কিছুকাল পূর্বে যে ব্যক্তি হয়ত জমিতে

লাঙল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই জানিত না, তাহারই অঙুলি সঞ্চালনে এখন কারখানা হইতে বিচিত্র যন্ত্রাদি নির্মিত হইয়া আসিতেছে। যেখানে যে-প্রকার যন্ত্র দরকার সেখানে সেইরূপ কারখানাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কৃষিযন্ত্র নির্মাণের কারখানা, তৈলখনির এলাকায় সেখানকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রের কারখানা বা কাপড়ের কল যেখানে রহিয়াছে সেখানে সেই রকম যন্ত্রের কারখানা নির্মিত হইয়াছে।

পূর্বতন রাশিয়ায় রসায়নশাস্ত্র ছিল একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ব্যাপার মাত্র। শিল্পপ্রসারে রসায়নের ব্যবহার কথা কেহ কল্পনাও করিত না। জার্মানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেইযুগে রাশিয়ার রাসায়নিক শিল্প অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল এবং যাহা কিছু রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল তাহার প্রায় সবগুলিই বৈদেশিক মূলধনে চলিত এবং কাঁচামালও ছিল বিদেশাগত। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার রাসায়নিক শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিল। যদিও এই বিষয়টি তৎকালে দেশে একেবারে নূতন ছিল তবুও বিজ্ঞানীদের কর্মকুশলতায় সেদিক দিয়া কোন অসুবিধাই দেখা দেয় নাই। নাইট্রোজেন, কোক সম্পর্কিত রাসায়নিক পদার্থ, রং, ঔষধ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি বিষয়ের শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাশিয়ায় ইতিপূর্বে ছিল না। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম তন্তু ও রেশম, প্ল্যাস্টিক দ্রব্যাদি, সংশ্লেষণপদ্ধতিতে তৈয়ারী রবার প্রভৃতি শিল্পও দ্রুত সম্প্রসারিত হইয়াছে। আলু হইতে উৎপন্ন এলকোহল দ্বারা কৃত্রিম রবার তৈয়ার করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে—ইহার অর্থ নৈতিক সম্ভাবনা অসামান্য। জারের আমলে জুতা ভিন্ন রবার অন্য কোন কার্যে বড় ব্যবহৃত হইত না। এক্ষণে রবারের ব্যবহার এতটা

বৃদ্ধি পায় যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ১৫টি রবারের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। পৃথিবীর অন্য কোথায়ও এত বেশী পরিমাণে কৃত্রিম রবার তৈয়ারী হয় না। এই কৃত্রিম রবার যে কার্যক্ষমতায় আসল রবারের চেয়ে কোন ক্রমে হীন নহে তাহা কারাকুম মরুভূমিতে ভ্রাম্যমান মোটরে ব্যবহার করিবার পর প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্টালিন বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে বোধ হয় রবার ব্যতীত সবই আছে—কিন্তু সে অভাবও শীঘ্রই বিদূরিত হইবে।" স্টালিনের আশা ফলবতী হইয়াছে।

সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারগণও শ্রমিকদের আর্থিকলাভ ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যন্ত্রাদিতে নব নব উন্নত ব্যবস্থার প্রচলন করিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সকল বৈজ্ঞানিক কর্মীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কাঁচামালের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার, তাপ ও বৈদ্যুতিকশক্তি বা তৈলকয়লার অপচয় নিবারণ করা এবং মানুষকে অহেতুক পরিশ্রম হইতে রেহাই দেওয়া। এই উদ্দেশ্যকে সফলতার দিকে লইয়া গিয়াছেন জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েট বিজ্ঞানী-সংঘ। সেই জন্যই সোভিয়েট শিল্প আজ এত উন্নত।

বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক শক্তি আজ মানুষের সেবায় নিয়োজিত হইয়া নূতনতর সৃষ্টি করিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানের সেবা অর্থ নিছক প্রাকৃতিক সত্যানুসন্ধান নয়, প্রাকৃতিক সত্যকে সমগ্ররূপে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে মানুষের শুভকর কার্যে পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করা, প্রকৃতির সকল সম্পদ ও শক্তির ভাণ্ডার মানুষের সেবায় উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। মানুষের জীবনে বিজ্ঞান

এখন রাশিয়ায় অনাবশ্যক বিলাস নহে—অপরিহার্য অবলম্বন। বিজ্ঞানের এমন কল্যাণী মূর্তি পৃথিবীর আর কুত্রাপি প্রকটিত হয় নাই।

সোভিয়েট জনসাধারণ আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহাদের সকল প্রকার বৈষয়িক উন্নতি হওয়া সম্ভব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় হইতেও তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্যেই রক্ষা পাইতে পারে। সেইজন্যই সোভিয়েট দেশের অধিবাসীরা অদৃষ্টবাদের পরিবর্তে পুরুষকারকে গ্রহণ করিয়া নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। বিজ্ঞানবোধই তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস বাড়াইয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। সোভিয়েট য়ুনিয়নে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ আজ আর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মস্তকে বর্ষিত নহে, সমগ্র সোভিয়েটবাসীকেই বিজ্ঞানের কল্যাণ-হস্ত স্পর্শ করিয়াছে।

শিল্পোদ্যমে রাশিয়ার স্থান

শিল্পজাত দ্রব্যাদি	১৯১৩	১৯২৮	১৯৩২	১৯৩৭	
	পৃথিবীতে স্থান	পৃথিবীতে স্থান	পৃথিবীতে স্থান	পৃথিবীতে স্থান	য়ুরোপে স্থান
সমগ্র শিল্প উৎপাদন	—	৫	৩	৩	১
বৈদ্যুতিক শক্তি	১৫	১০	৭	২	১
কয়লা	৬	৬	৪	৪	৩
পীট	—	—	১	১	১
পেট্রোলিয়ম	২	৩	২	২	১
কাচা লৌহ (পিগ)	৫	৬	৫	১	১
ইস্পাত	৫	৫	৫	২	১
ইঞ্জিনিয়ারীং (সাধারণ)	৪	৪	২	২	১
ইঞ্জিনিয়ারীং (কৃষি)	—	৪	২	১	১
ট্রাকটর	—	৪	২	১	১
মোটর গাড়ী	—	১২	৭	৫	৩
লরী	—	১১	৬	১	১
তাম্র	৭	৯	৯	৩	১
আলুমিনিয়ম	—	—	১১	২	১
সিমেণ্ট	—	৮	৭	২	১
পাদুকা দ্রব্যাদি	—	৫	৩	২	১
সাবান	৬	৫	৫	২	১

পৃথিবীর শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা কতভাগ সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপন্ন হইতেছে।	১৯২৯	১৯৩২	১৯৩৬	১৯৪২	পরিকল্পনা
	৩·৮	১১·০	১৫ ২	৩২·০	

কৃষি-উন্নয়ন

কৃষকের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ প্রায় সর্বদেশেই খুব স্বল্প, জারশাসিত রাশিয়াতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামান্য কিছু প্রচলিত থাকিলেও কৃষিকার্য ছিল বিজ্ঞানের সভায় অপাংক্তেয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষক যে-পদ্ধতিতে হলচালনা করিয়া বীজ বপন ও শস্য আহরণ করিত, বহু সহস্রবর্ষ পরেও পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ আজও প্রায় সেই পদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, বিজ্ঞান তাহাকে নূতন কোন পথে চালনা করে নাই,—একথা বলিলে খুব ভুল হইবে না। মানুষের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাবে যে পরিবর্তন আসিয়াছে কৃষিপদ্ধতিতে তেমন কিছু হয় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীনে বিজ্ঞান বিশ্বমানবগোষ্ঠীর এই উপেক্ষিত অংশীদারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে এবং তাহারই ফলে কৃপণা বসুমতীর ভাণ্ডার হইতে প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জানেন, প্রকৃতির নিকট হইতে মানুষ কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারে না, প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন দানই দিবে না, তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে হইবে।

সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর স্বল্পকালমধ্যে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবরূপ প্রদান করিবার জন্য রাশিয়ায় নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে সোভিয়েট রাশিয়ায় চৌদ্দ হাজার বৈজ্ঞানিক কর্মী কৃষি-বিষয়ক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এতদুদ্দেশ্যে ৯০টি গবেষণাগার, ৩৬৭টি পরীক্ষাকেন্দ্র এবং

বহুসংখ্যক শাখা-প্রতিষ্ঠান-সম্বলিত ৫০৭টি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে। এতদ্ব্যতীত যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় বিশ হাজার ছোটবড় লেবরেটরী আছে যেখানে বহুবিধ গবেষণার কার্য হইয়া থাকে।

বহুবিস্তৃত দেশ রাশিয়া, কিন্তু তাহার সামান্য অংশেই কৃষিকার্য প্রচলিত ছিল। দেশের এখানে সেখানে অকর্ষিত ভূভাগের বিস্তৃতি বড় কম ছিল না। তুন্দ্রা ও তাইগা অঞ্চলে কৃষিকার্য হইত না। মরুভূমি অঞ্চলে চাষ করার কথা উঠিতেই পারে না। দক্ষিণাংশ তাপাধিক্য ও অনাবৃষ্টির দরুন কৃষির অনুপযুক্ত ছিল; আবার শীতাধিক্য ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য উত্তরাংশে কৃষিকার্য সম্ভব ছিল না। কোন কোন অঞ্চলে বিস্তৃত ভূভাগে চাষ করা হইত না, আবার অন্যত্র হয়ত চাষের উপযুক্ত জমির অভাবে মূল্যবান বনভূমিকে ধ্বংস করিয়া কৃষির ব্যবস্থা করা হইত। এমনি নানা বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য দিয়া গড়া ছিল প্রাচীন রাশিয়া। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা ভূপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া রাশিয়ার কৃষি অনিয়ন্ত্রিত রূপে গতানুগতিক ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। বিশেষ করিয়া দেশের খাদ্যশস্যের চাহিদাকে উপেক্ষা করিয়া পুঁজিপতির আর্থিক আনুকূল্যের উদ্দেশ্যে দেশে অর্থকরী শস্যের চাষ বাড়িয়া উঠিতেছিল। কোথায়ও বা তুলার চাষ ছাড়া অন্য কিছুর চাষই করিবার ব্যবস্থা ছিল না। বৎসরে জমিতে হয়ত ঐ একটি কৃষি করিয়াই কৃষক কর্তব্য শেষ করিত। কিন্তু অর্থকরী শস্য বপন করিয়া যখন কৃষক দুই পয়সা পাইবার আশা করিত তখন হয়ত স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীর চক্রান্তে সেই শস্যের দাম কমাইয়া দেওয়া হইত। কৃষকের স্বপ্ন ধোঁয়ায় উড়িয়া যাইত—উপরন্তু হয়ত খাদ্যাভাবে তখন তাহাকে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম

করিতে হইত। এমনি আশা নিরাশার অনিশ্চিত তরঙ্গে হাবুডুবু খাইত রাশিয়ার কৃষক ও জনগণ।

বিখ্যাত অক্টোবর বিপ্লবের পর ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে—রাশিয়ার গ্রামাঞ্চল তথা কৃষিক্ষেত্রের চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। প্রাচীন রাশিয়ায় দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জমির মালিক ছিল জমিদার, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাজপরিবার। বিপ্লবের পর সমস্ত জমি রাষ্ট্রের হস্তগত হইল। ব্যক্তিগত মালিকানা শেষ হওয়াতে কৃষিবণ্টন কার্য সুনিয়ন্ত্রিত হইল। কৃষির উন্নতির জন্য নূতন বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রবর্তন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই সব পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য মালিকানা লোপ ও যৌথ কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তন আশু ও প্রাথমিক কর্তব্য হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাকে বাদ দিলে সোভিয়েট কৃষকের অবস্থা কোন ক্রমেই উন্নত হইতে পারিত না। জারের আমলে রাশিয়ায় কৃষির উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই ছিল না। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সোভিয়েট কৃষক আজ জমির সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে—কিন্তু এখন আর সে একক নয় বা তার সংগ্রামও নিরস্ত্র নয়—বিজ্ঞান তার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তাহারই ফলে একদা যে জমি ছিল চাষের অযোগ্য এখন তাহা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিতেছে। আজ বিজ্ঞানের হাতে পড়িয়া দেশের ভূপ্রকৃতির রূপ বদলাইতেছে।

কৃষি-উন্নয়ন ব্যাপারকে কয়েকটি বিভিন্ন কার্যে ভাগ করা যাইতে পারে। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা তন্মধ্যে প্রধান। তারপর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এইজন্য প্রয়োজন ভাল বীজ সংগ্রহ, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, উদ্ভিদের জীবন ধারার

পরিবর্তন সাধন ও নিয়ন্ত্রণ, কৃষির শত্রু ও জৈব উপদ্রব দূরীকরণ, উন্নত ধরণের কৃষিযন্ত্রাদি নির্মাণ। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ইহার প্রত্যেকটি কার্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত হইয়া অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ শতকরা ২৮ ভাগ বর্ধিত হইয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে অনুপযুক্ত অনেক জমিকে নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা দ্বারা কৃষির উপযোগী করিতে হয়। অনুপযুক্ত জমির শ্রেণীতে পড়ে জলাভূমি, মরুভূমি ও মেরুঅঞ্চল। ইহাদের প্রত্যেকটিকে ব্যবহারযোগ্য করিবার জন্য নানারূপ বিস্ময়কর পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৃষিকার্যের জন্য বৃষ্টি ও মাটিতে জল বা রসের প্রয়োজন। রাশিয়ার প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় এই জলের অবস্থা সর্বত্র কৃষির অনুকূল নহে, কোনস্থানে অতিবৃষ্টি, কোন স্থানে অনাবৃষ্টি। জর্জিয়া অঞ্চলে বাটুমের নিকটবর্তী স্থানে বার্ষিক বারিপাত ২৬০ সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার), শ্বেতরাশিয়ায় ৬০, ভলগা নদীর বামতীরে ৩০ ও আমুদরিয়ার নিম্নপ্রদেশে মাত্র ৮ সেন্টিমিটার। সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ জলাভূমি, দক্ষিণাংশ জলাভাবে শুষ্ক। সোভিয়েট রাশিয়ার এই প্রাকৃতিক বৈষম্য দূর করা হইয়াছে জলাভূমির জলনিকাশ ও শুষ্কস্থানে জলসেচের ব্যবস্থা দ্বারা।

উত্তর সোভিয়েটের আবহাওয়া আর্দ্র ও শীতল। সেখানে অতিবৃষ্টিতে মাটিতে যে জল জমে তাহা সহজে শুকায় না, মাটিতেই আটকা পড়ে এবং তাহারই ফলে জলাভূমির সৃষ্টি হয়। শ্বেত-রাশিয়ার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই রকম কৃষির অনুপযুক্ত জলাভূমি, সেখানে কলের লাঙলের চাকা কাদামাটিতে আটকাইয়া যায়। বিশেষ

প্রক্রিয়াদ্বারা সেই অঞ্চলের জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ক্যাটারপিলার ধরণের ট্রাকটরের পিছনে চলে খাদ কাটিবার যন্ত্র, মাঠের মাঝে সৃষ্টি করে পয়ঃপ্রণালী, বিস্তীর্ণ জলাভূমি রূপান্তরিত হয় উর্বর কৃষিক্ষেত্রে। দেখিতে দেখিতে সমগ্র দেশের চেহারা পরিবর্তিত হয়। এই সকল জলাভূমি অঞ্চলের জমিতে প্রচুর শস্য জন্মে, বিশেষ করিয়া শাকসবজী তৃণাদি। এই প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা শ্বেত-রাশিয়ার অনেক স্থানের 'বিস্ময়কর পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে হয়ত যেস্থানে মশকপূর্ণ জঙ্গল ছিল, দূষিত বাতাস বহন করিয়া আনিত রোগবীজাণু, এখন সেই সব স্থান দিব্যি স্বাস্থ্যকর কৃষি-অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার এই জল-নিকাশ ব্যবস্থা জটিল পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার ফলে নূতন জলপথ, মাছচাষের নূতন জলাশয় প্রভৃতি নির্মিত হইতেছে। শ্বেতরাশিয়া ব্যতীত লেনিনগ্রাড প্রদেশ, পশ্চিম সাইবেরিয়া অঞ্চল, মস্কৌ প্রদেশ এবং দূরবর্তী উত্তরাঞ্চলে জল-নিকাশ ব্যবস্থা দ্বারা বিস্তীর্ণ ভূভাগকে কৃষির উপযোগী করা হইয়াছে।

ট্রান্‌স্‌ককেশাসের কলচিস্‌ এলাকায় পলি জমিয়া নদীর মুখ ভরাট হইয়া যায় এবং এই কারণে নদীর জল সমুদ্রে যাইবার পথ না পাইয়া দেশাভ্যন্তরে জলাভূমি এবং আনুষঙ্গিক জঙ্গল, মশা ও ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে। জলনিকাশের ব্যবস্থা দ্বারা এই সকল স্থানের নবজন্ম হইতেছে। একদা যাহা অস্বাস্থ্যকর অনুর্বর প্রদেশ ছিল, বিজ্ঞানের যাদুদণ্ড স্পর্শে তাহা শস্যশ্যামলা সমৃদ্ধ মনোরম স্থানে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার এক-সপ্তমাংশ স্থান মরুভূমি—মধ্য এশিয়ার

সমতলভূমি, ভলগা নদীর দক্ষিণস্থ দেশ এবং কাজাকস্থান। এখানে বৎসরে ২০ সেন্টিমিটারের বেশী বৃষ্টি হয় না এবং এমন অনেক স্থান আছে যেখানে বারিপাতের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায়। এতদঞ্চলে নদনদীর সংখ্যা কম। এই বালুকাময় মরুভূমির মধ্যেই এমন স্থান অনেক আছে যেখানকার বাত্যাবাহিত 'লোয়েস' মাটি খুব উর্বর। এখানকার বাতাস শুষ্ক, সূর্যতাপ প্রচণ্ড। মাটি, বাতাস, তাপ সব কয়টিই কৃষির পক্ষে পরমোপযোগী, অভাব কেবল জলের। এই অঞ্চলে বৃক্ষাদি যাহা কিছু জন্মে তাহারা অল্পদিনে বর্ধিত হয়। তুলার গাছে যে তুলা হয় তাহার সমানুপাতিক পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। গাছের ফলে শর্করার ভাগ অধিক। নানাজাতীয় ফল, রবার, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি বৃক্ষ এই সব দেশে জন্মান সম্ভব। জমিতে ও আবহাওয়ায় প্রচুর সম্পদ রহিয়াছে—প্রয়োজন জলসেচনের। সোভিয়েট রাষ্ট্র এই মরুভূমিতে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা করিতেছে। নব নব পরিকল্পনায় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মরুর বুকে প্রবহমান জলস্রোতের ব্যবস্থা করা হইতেছে। নদী তাহার পূর্বতন চিরচলিত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চালিত হইয়াছে। তাজিকিস্থানে ভীখস নদীকে এমনই পরিকল্পনায় বহু ক্ষুদ্র জলস্রোতে বিভক্ত করিয়া মরুভূমিতে তুলার চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র জলপথগুলি একত্রিত করিলে উহাদের মোট দৈর্ঘ্য ২০।২৫ হাজার মাইল হইবে। মাত্র কয়েক বৎসর আগে যেখানে ছিল মরুভূমি এখন সেখানে সমৃদ্ধ জনপদের পত্তন হইয়াছে। এই প্রকার ভলগা, নিপার, আমুদরিয়া প্রভৃতি নদীকেও নূতন পথে চালনা করা হইতেছে।

কিন্তু মরুভুমি ত এতটুকু জায়গা নয়। মাত্র গোটা কয়েক নদীর জলে সমগ্র মরুভূমিকে বারিপ্লুত করা সম্ভব নয়। নদীর জলও অফুরন্ত নয়। তারপর এমন অনেক স্থান আছে যেখানকার উচ্চতা বেশী—নদীকে সে পথে চালনা করা যাইবে না। তবে কি মরুভূমি চিরদিনই প্রাণহীন হইয়াই থাকিবে? মানুষের ক্ষমতা কি ওখানে নিষ্ফল হইবে? মরুভূমিকে কি পরিপূর্ণরূপে মানুষের কাজে লাগান যাইবে না? সোভিয়েট বিজ্ঞান এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছে।

মরুভূমির বালুকারাশির একটা বিশেষ গুণ আছে। অত্যধিক তাপে মরুদেশ শুষ্ক বটে, বারিপাত হইবামাত্র উত্তপ্ত বালুকারাশির তলে জলরাশি বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু এই জল যায় কোথায়? উহা বাষ্প হয় কম, বালির নীচে জমা থাকে উহার বেশীর ভাগ। দীর্ঘমূলসম্পন্ন উদ্ভিদেরা এই জল সংগ্রহ করিতে পারে। মরুপ্রদেশে চাষ করিবার জন্য এই জাতীয় উদ্ভিদের ব্যবহার করা হইতেছে। মরুভূমির যেখানে বালুকা চূর্ণীকৃত হয় নাই সেই সব অঞ্চলে একপ্রকার শুষ্ক ঘাস জন্মে, এই তৃণদল মেষাদি পশুর পক্ষে খুব পুষ্টিকর। মরুভূমিকে এই দিক দিয়া কাজে লাগান যাইতে পারে। 'ডেজার্ট কালটিভেশন বুরো' নামক সোভিয়েট রাশিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থামত মরুভূমিকে ব্যবহারে লাগান হইতেছে। যেসব মরুঅঞ্চলে জলসেচন সম্ভব নহে সেইসব স্থান মেষপালনক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শুষ্ক আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে এমন সব উদ্ভিদাদির চাষের উপায় নির্ধারিত হইয়াছে। এরোপ্লেনে চড়িয়া আকাশ হইতে বীজ বপন করিবার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার

জ্বালানী কাঠের গাছও মরুভূমিতে জন্মিতে পারে। মরুভূমিতে নানাপ্রকার ফলফুলেরও চাষ হইতেছে। এই সকল সিদ্ধির মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মীর যোগাযোগ।

তারপর কৃষির উন্নতি। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের বিবরণীতে জানা যায় যে সেই সময় যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের অধীন ভূমির শতকরা ৭০ টিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপন করা হইত। বীজপরীক্ষার্থ রাষ্ট্রের অধীনে দেড়-হাজারের বেশী পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানে বীজ সংগ্রহ ও পরীক্ষা কার্য চলে এবং এই উপায়ে সর্বদাই প্রত্যেক কৃষককে ভাল বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী উদ্ভিদের জীবন প্রায়শ বড় সৌখীন, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য ও ফলমূলের উদ্ভিদগুলির। ইহাদের প্রত্যেকটির জন্য যথোপযুক্ত ভূমি, আবহাওয়া, রৌদ্রবৃষ্টি, শীতাতপ দরকার। কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি ঘটিলে উদ্ভিদের জীবন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে কিংবা ফলন কমিয়া যাইবে। সকল শস্য সব দেশের মাটিতে বা আবহাওয়ায় হয় না, বৎসরের নির্দিষ্ট ঋতুতে বিশেষ শ্রেণীর শস্য জন্মিয়া থাকে, ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা। বিজ্ঞান এই রীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া এই ব্যাপারে অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

একজাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের সঙ্গে অপর জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের যৌনমিলন সংঘটিত হইলে যে সন্তান বা বীজ উৎপন্ন হয় তাহাকে বর্ণসংকর বলা হয়। বংশানুকৃতি নিয়মানুযায়ী সন্তান পিতা ও মাতা উভয়ের গুণেরই অধিকারী হইয়া থাকে। মানুষ চেষ্টা দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে বিবিধ প্রকার বিরুদ্ধ মিলন ঘটাইয়া নানা মিশ্রজাতীয় উদ্ভিদ বা প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছে—ইতিপূর্বে যাহাদের

স্বাভাবিক অস্তিত্ব ছিল না। পার্বত্য অঞ্চলে যে-সকল উদ্ভিদ জন্মে সেইগুলি তদ্দেশীয় কঠিন মাটি, শীতাধিক্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশে বর্ধিত হইতে অভ্যস্ত, আবার সমভূমির বৃক্ষলতাদির পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক। এই কারণে বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলের উদ্ভিদের প্রকৃতিতে পার্থক্য রহিয়াছে।

রাশিয়ার পরলোকগত আই, ভি মিকুরীন প্রমাণ করিয়াছেন যে অনুকূল পরিবেশে বর্ধিত হইতে দিলে বর্ণসংকর উদ্ভিদকে যে কোন বৈশিষ্ট্য প্রদান করা যায়। তিনি সাইবেরিয়া, কানাডা ও অন্যান্য পার্বত্য প্রদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে রাশিয়ার দক্ষিণাংশের সমভূমিজাত উদ্ভিদের মিলন ঘটাইয়া নানাজাতীয় বর্ণসংকর উদ্ভিদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল উদ্ভিদে পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদের মত কঠিন আবহাওয়া-সহনশীলতা, ব্যাধির প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার স্বভাবজাত ক্ষমতা সবই বিদ্যমান থাকে; উপরন্তু দক্ষিণাঞ্চলের উদ্ভিদসুলভ গুণ—যেমন ফলের স্বাদ, বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতিরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। তিনি প্রায় তিনশত প্রকার নূতন ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জাতীয় আবিষ্কারের ফলে ফলবান বৃক্ষের চাষ ক্রমশ রাশিয়ার দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাংশে মেরু প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং এতাবৎকাল যেখানে ফলের চাষ সম্ভব ছিল না সেখানেও অফুরন্ত ফলোৎপাদন করা হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জেনীচেস্ক অঞ্চলে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কোন ফলের বাগানই ছিল না, এখন সেখানে সহস্রাধিক একর জমিতে ফলের চাষ হইতেছে এবং ঐ পরিমাণ ভূমিতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রও রহিয়াছে। পশ্চিমে ককেশাস্ অঞ্চলের বেলাভূমিতে নূতন করিয়া অম্লস্বাদ ফল (নেবু, কমলানেবু

প্রভৃতি) এবং চায়ের চাষ করা সম্ভব হইয়াছে এবং এই কৃষি উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে। জর্জিয়া অঞ্চলের নেবুজাতীয় ফল গোটাদেশের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এই সম্ভাবনার মূলে রহিয়াছে মিকুরীনের আবিষ্কার ও তাঁহার সহকর্মী ও অনুগামীদের বৈজ্ঞানিক সাফল্য। সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় মিকুরীন প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশটি শাখা আছে এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে বহু বৈজ্ঞানিক কর্মী ফলের চাষ বিষয়ক গবেষণায় রত আছেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে মিকুরীনের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। বীজবিহীন ফলোৎপাদন এবং তাড়িৎশক্তির সহায়তায় উদ্ভিদের প্রকৃতির পরিবর্তন তাঁহার অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল।

সোভিয়েটে কৃষির এই জাতীয় উন্নতি বিধানে লাইসেন্‌কো নামক বিজ্ঞানীর দান উল্লেখযোগ্য। তিনি আবিষ্কার করেন, বর্ষজীবী উদ্ভিদদের জীবনধারা স্তরে স্তরে বিকশিত হয়। প্রথম দুইটি স্তর কাটে উত্তাপ ও আলোর ভিতর দিয়া। বীজবিভেদে বীজাভ্যন্তরে ভ্রূণের পরিপুষ্টির জন্য কোনটির দরকার উত্তাপ, কোনটির বা শৈত্য, কোনটির আলো। এই রকম অধ্যায়ের ভিতর দিয়া চলিয়া বীজের অভ্যন্তরে ভ্রূণ ধীরে ধীরে অঙ্কুরোদ্গমের দিকে অগ্রসর হয়। লাইসেনকো দেখিলেন তাপ, শৈত্য বা আলো প্রয়োগে উদ্ভিদের বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম বা শস্যফলন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি বপনের পূর্বে গৃহাভ্যন্তরে উত্তাপে রাখিয়া দেখিলেন যে ইহারই ফলে বীজ হইতে চারা বাহির হইবার সময় দুই তিন দিন আগাইয়া যায় এবং প্রতি একরে শস্যফলন ৯০ হইতে ১৮০ পাউণ্ড বর্ধিত হয়। বপনের পূর্বে বীজকে এই রকম শীতাতপ বা আলোর ক্রিয়ার অধীন

করিবার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ভার্ণালিজেশন (Vernalisation)। এই পদ্ধতিদ্বারা শীতের ফসলকে গ্রীষ্মকালে বপন করা সম্ভব হইয়াছে, উদ্ভিদে শস্যফলন ত্বরান্বিত করা হইয়াছে। ইহাতে সোভিয়েট রাশিয়ার শস্যসমৃদ্ধি অদ্ভুতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শস্যফলনের কালকে সংক্ষিপ্ত করিবার ফলে মেরু অঞ্চলে কৃষি প্রসার লাভ করিয়াছে। ঐ প্রদেশে দিনমান কখনও খুব স্বল্পকালের বা বৎসরের কতক সময়ে মাত্র দিনমান বড়। এই সব কারণে ঐ স্থানে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না। কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার ফলে সেখানে কৃষি সম্ভব হইয়াছে, ইতিপূর্বে হয়ত ঐ দেশে কোন শস্যই জন্মিত না।

সিট্‌সিন নামক একজন 'একাডেমী অফ সায়েন্সেসের' সভ্য আরও একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার তথ্যের গোড়ার কথা কৃষিজাত উদ্ভিদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দবনজাত উদ্ভিদের (আগাছা) মিলন ঘটান। ইহার দ্বারা নানা রকম অদ্ভুত সত্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গমের চারার সঙ্গে বন্য কৌচ ঘাসের মিলনদ্বারা একজাতীয় বীজগম পাওয়া যায় তাহা হইতে যে চারা জন্মে সেই গাছ বর্ষজীবী নহে, একবার বীজবপন করিলে তাহাতে সাত আট বৎসর শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে এমনি গুণসম্পন্ন কোন গমের অস্তিত্ব ছিল না। এই দীর্ঘজীবী গাছের আরও অনেক গুণ আছে—অনাবৃষ্টিতেও ইহাদের বৃদ্ধি ও শস্যোৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকার অসম মিলন দ্বারা নানা জাতীয় বীজগম উৎপন্ন করা হইয়াছে যেগুলি বিভিন্ন আবহাওয়ায় ও মাটিতে বপনযোগ্য। ইহার ফলে যেখানে কখনও গমের চাষ সম্ভব ছিল না সেই সব অঞ্চলেও গমের চাষ করা হইতেছে। মধ্য এশিয়ায় 'রাই' ভিন্ন অন্য কোন শস্য জন্মিত না। সেখানে এখন গম

জন্মে। গমের সাদারুটি রাশিয়ায় এককালে একান্ত বিলাসীর খাদ্য ছিল, চাষীর ভাগ্যে তাহা কদাচিৎ জুটিত। এখন গমের রুটি কৃষকের অপরিহার্য খাদ্য, কারণ যেসব অঞ্চলে ইতিপূর্বে গমের উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না, বিজ্ঞানের সহায়তায় গমকে সেই আবহাওয়ার উপযুক্ত করিয়া লওয়ায় গম এখন সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বত্র সুলভ হইয়াছে।

কৃষিবিষয়ক এই প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাফল্যের পর সোভিয়েট রাশিয়ায় শস্যোৎপাদন ব্যাপারে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় রাশিয়ার উত্তরাংশে কীয়েফ হইতে স্বারডলোভস্ক পর্যন্ত একটা সীমা রেখা টানা হইত। ইহার দক্ষিণাংশে কৃষ্ণ মৃত্তিকার দেশ—সেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য জন্মিত—সেই শস্য উত্তরাংশের চাহিদা মিটাইত। খাদ্যশস্যের জন্য উত্তরাঞ্চলকে দক্ষিণাঞ্চলের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। উত্তরাঞ্চলের এই দৈন্য জমির স্বল্পতাহেতু নহে, এই ভূভাগে শতকরা ৭৫ ভাগ জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিত। জমিতে আবাদ না হইবার কারণ জমির অনুর্বরতা নহে। ডেনমার্কের জমি রাশিয়ার এই অঞ্চলের জমি অপেক্ষা ভাল নহে, কিন্তু সেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী শস্য উৎপন্ন হয়। তবে কি আবহাওয়ার দোষ? তাহাও নহে। রাশিয়ার উত্তরাংশে যদিও শীত বেশী—কিন্তু একথাও বিবেচ্য যে সেই অঞ্চলে দক্ষিণাংশের মত প্রচণ্ড সূর্যতাপের উৎপাত নাই। কিন্তু তবুও সেই অঞ্চলের এই দৈন্য কেন? এই দৈন্যের কারণ সেখানকার জমিকে চাষযোগ্য করিয়া তুলিতে যে অর্থ ও যান্ত্রিক সামর্থ্য দরকার জারের আমলে রাশিয়ার তাহার কোনটাই ছিল না। বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রয়োগে চাষের অযোগ্য জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে চাষের ব্যবস্থা

হইয়াছে এবং যে জমিতে যে শস্য জন্মান সম্ভব ছিল না তাহা সম্ভব হইয়াছে ও সেই অঞ্চলে এখন প্রধান খাদ্যশস্য হিসাবে গমের চাষ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ধানের আবাদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধানের চাষ করিবার জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার। সোভিয়েট রাশিয়ায় ধানকে শীতের কৃষিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে এবং ধানের চাষ ক্রমশ উত্তরাঞ্চলে প্রসার লাভ করিতেছে।

উদ্ভিদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করিবার রহস্য বৈজ্ঞানিক মহলের আয়ত্ত হইবার পরে সোভিয়েট রাশিয়ায় এমন বহু উদ্ভিদ জন্মান হইতেছে যাহা পৃথিবীর অন্য কোন দেশেরই একচেটিয়া ছিল। পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ জন্মে তাহার শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের কোন কাজে লাগে না। রাশিয়ায় অনেক 'অকেজো' বৃক্ষকে কাজে লাগান হইতেছে। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার উদ্ভিদসম্পদ খুবই সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। গোটা কয়েক প্রচলিত খাদ্যশস্যের চাষই গতানুগতিক ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন উদ্ভিজ্জ কাচামালের চাহিদা বাড়িতে লাগিল। রবার, গদ্, ভার্ণিশ, তৈলজাতীয় দ্রব্যাদি, ট্যানিন, রঞ্জন দ্রব্য, কর্ক, প্ল্যাসটিক পদার্থ, রেয়নের (কৃত্রিম সিল্ক) উপাদান প্রভৃতির জন্য নূতন নূতন উদ্ভিদ দরকার হইতেছে।

বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশবিদেশের নানা জাতীয় উদ্ভিদকে রাশিয়ার মাটি ও আবহাওয়ায় জন্মাইবার উপায় নির্ধারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের চা, ভার্ণিশের উপাদান উৎপাদনকারী চীনদেশের টুং-হু বৃক্ষ, আলজিরিয়ার কর্ক-ওক, জাপানের খেজুর, অস্ট্রেলিয়ার একাশিয়া, ব্রেজিলের বাঁশ, প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্য রাশিয়ায় উপযুক্ত অঞ্চল খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেখানে ঐগুলি জন্মাইবার ব্যবস্থা করা

হইয়াছে। সারা পৃথিবীর উদ্ভিদেরা এখন রাশিয়ায় মাটিতে যাইয়া সেখানকার জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। তুর্কমেনিয়ায় মেক্সিকোর রবারবৃক্ষের চাষ হইতেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাটাটা নামক আলু জাতীয় এক উদ্ভিদ সোভিয়েট য়ুনিয়নের দক্ষিণাঞ্চলে জন্মিতেছে। মাঞ্চুরিয়ার সোয়াবীন, পালেস্টাইনের সোরঘাম ও নানা দেশের নানা ফল এখন রাশিয়ায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। খনিজদ্রব্যের মতই কৃষিদ্রব্যের ব্যাপারেও সোভিয়েট রাশিয়া পরমুখাপেক্ষী নহে।

উদ্ভিদবিষয়ক গবেষণায় সোভিয়েট রাশিয়া বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাতে মরুর ফল মেরুতে জন্মিতেছে, জলা-প্রদেশের শস্য মরুতে উৎপন্ন হইতেছে। এনিসি নদীর তীরবর্তী ক্রাস্নোয়িয়ারস্ক অঞ্চলে একজাতীয় আপেল জন্মিতেছে যাহা ইতিপূর্বে মরুভূমিতে জন্মিত। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে উক্ত এনিসি অঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা—৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেরও নীচে নামে। মধ্য এশিয়া হইতে মুলবেরী গাছ বাসকিরিয়ায় গিয়াছে এবং পীচ গাছ গিয়াছে ইউক্রেনে। এমনি করিয়া দেশের মাটি ও আবহাওয়ার বিশেষত্বকে জয় করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক বৈষম্য উদ্ভিদের জীবনে এখন কোন সংকটই সৃষ্টি করিতে পারে না।—নূতন নূতন কৃষির অঞ্চল তৈয়ারী করা হইতেছে—পামীরের উচ্চ পার্বত্য প্রদেশে, বিরোবিজানের গহন অরণ্যে এবং সর্বোপরি চিরতুষার ক্ষেত্র উত্তরমেরু অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারিত হইতেছে। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে নবরূপে সাজাইয়াছে।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে কৃষিপ্রধান দেশগুলি উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত এবং শীতপ্রধান দেশ

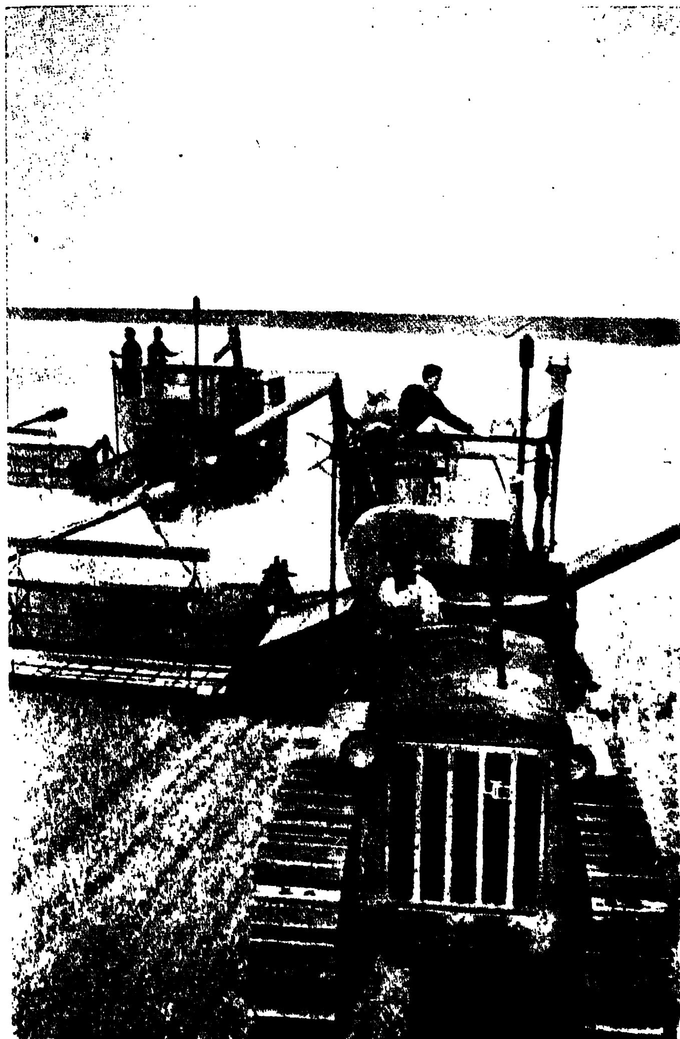
গুলি প্রায়ই শিল্পপ্রধান। ইহার কারণ এই যে প্রাকৃতিক নিয়মে কৃষিজাত উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন। রাশিয়ার যে অংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত উহাতেই কৃষির ব্যাপক প্রচলন আছে, পক্ষান্তরে লেনিনগ্রাডের উত্তরাংশে খুব সামান্য জমিতেই কৃষিকার্য হইত এবং আরও উত্তরভাগ অর্থাৎ মেরু সাগরতীরে কৃষিকার্য একেবারে অজ্ঞাত। সেখানে আছে তুন্দ্রা অঞ্চল—চিরতুষারাচ্ছন্ন। সেখানে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষাদি নাই। এখানে 'না ছিল কোন গ্রাম, না কোন সহর। বহু দূরে দূরে কোথায়ও বা যাযাবর জাতীয় লোকদের তাবু চোখে পড়িত—তাহারা কৃষিকার্য জানে না, কেহ বা হরিণ শিকার করে, কেহ বা করে মৎস্য শিকার। রাশিয়ার মানচিত্রের উত্তরাংশে কৃষি অঞ্চলের শেষ সীমারেখা বলিয়া একটা রেখা টানা হইত। বহু শত শতাব্দী ধরিয়া এই সীমারেখা অপরিবর্তিত ছিল—সমগ্র রাশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ ছিল এমনি কৃষিকার্যবর্জিত। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীনে এই সীমারেখা সম্প্রতি অনেকটা সরিয়া গিয়াছে।

ভৌগোলিক অভিযানের পরে মেরু অঞ্চলে গিয়াছে ভূতাত্ত্বিক অভিযাত্রী দল। তাহাদের চেষ্টায় কয়লা, তৈল, এপেটাইট ও অন্যান্য ধাতু পদার্থের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং খনিজ শিল্প সেখানে ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে। নূতন সামুদ্রিক বন্দর স্থাপিত হইয়াছে। সেই তুষারপ্রদেশে বড় বড় নগর গঠিত হইয়াছে এবং মানুষের বসতি ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে। এই কারণে খাদ্যসামগ্রী ও শস্যাদির চাহিদা বাড়িতেছে ; বিশেষ করিয়া শাকসবজী ও দুধের প্রয়োজন খুব বেশী হইয়াছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া লইতে হয়, কিন্তু সেজন্য না আছে কোন রাস্তা বা

যাতায়াতের ব্যবস্থা। একমাত্র নদীপথে টাইগা অঞ্চলে মাল চলাচল সম্ভব, কিন্তু তাহাও কেবল গ্রীষ্মকালে। আবার তুন্দ্রা অঞ্চলে যাইবার ব্যবস্থা কেবলমাত্র বরফে চলা স্লেজগাড়ি, কিন্তু সে তো শীতকাল ছাড়া চলিবে না। তাই এদেশের একাংশ সর্বদাই দুর্গম ছিল, কার্যত এই অঞ্চলে মালপত্রাদি চালান করিবার কোন উপায় ছিল না। এইরূপে খাদ্যসংস্থান না থাকায় ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিবর্ধনে ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। বিজ্ঞান এখানে সহায় হইয়াছে।

বিজ্ঞানকে ঐ প্রদেশের প্রকৃতির পরিবতন করিতে হইয়াছে। দেশের মাটিতে পাথর—পাথর যেখানে নাই সেখানে জলাভূমি। গ্রীষ্মকাল খুবই ছোট—শীতকাল প্রায় নয় মাস। ঐ দেশে কৃষি—সে ত স্পষ্টত অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীর উদ্যম কোন কার্যকেই অসম্ভব মনে করে না। কৃষি বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য মেরু প্রদেশে 'অল য়ুনিয়ন ইন্‌স্‌টিটিউট অফ প্ল্যাণ্ট কালচারের' অধীনে অনেক কৃষি গবেষণাগার গঠিত হইল এবং কৃষির প্রচেষ্টা শুরু হইল। জমির প্রস্তর সরান হইল, জলাভূমির জল নিষ্কাশিত হইল। অম্লরসপ্রধান জমিকে ক্ষারসংযোগে কৃষির উপযুক্ত করা, জমিতে ব্যাকটিরিয়া শ্রেণীর উদ্ভিদ্ সংযোগ করা, এইগুলি ছিল গবেষকদের প্রাথমিক কার্য। ইহা শুধু গবেষণা নয়, ভূপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন সাধন। নানা দেশ হইতে নানা রকম গাছ আনিয়া অসম যৌনমিলন দ্বারা নূতন গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করার কার্য অগ্রসর হইয়া চলিল।

দেশের তাপাভাবকে আলোর প্রাচুর্য দ্বারা কাজ চালাইবার উপায় আবিষ্কৃত হইল। খিবনীতে গ্রীষ্মকালে দেড়মাস কাল সূর্য



সমবায় খামারে সোভিয়েট চাষীরা ট্রাক্টর চালাইয়া ফসল কাটিতেছে।

অস্ত যায় না। এমন বীজ-গম সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা অল্প সময়ে ফল ধারণ করে এবং স্বল্পকালব্যাপী গ্রীষ্মের মরশুমেই পাকিয়া উঠে।

বিজ্ঞানীর অদম্য উদ্যমের কাছে প্রকৃতি বশীভূতা হইয়াছেন। গবেষণার ফলে মেরুঅঞ্চলে চাষযোগ্য নূতন রকমের বার্লি, ওট, আলু ও অন্যান্য মূলজাত খাদ্য, শাকসবজি, ঘাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইয়াকুতিয়া অঞ্চলে প্রায় বারমাস বরফ পড়ে; সেখানেও নূতন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্ভব হইয়াছে। 'ওর্জনীকীড্‌জ যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানের এলাকাতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৯° ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড)। এই স্থানেও প্রতি একরে ২২টন বাঁধাকপি উৎপন্ন হয়। এই সব অঞ্চলে কৃষি যে আদৌ সম্ভব পঁচিশ বৎসর আগে একথা কেহ কল্পনাও করে নাই। শুধু কৃষি যে সম্ভব হইয়াছে তাহাই নহে, শস্যফলন ব্যাপারেও অভূতপূর্ব সাফল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যভাগে প্রতি একরে যে পরিমাণ আলু জন্মে, খিবনীতে জন্মে তার তিনগুণ। গ্রীষ্মমণ্ডলের বার্লি ও গম এখন মেরুপ্রদেশে যথেষ্ট জন্মে।

মেরু অঞ্চলে ছাব্বিশটি উপজাতি রহিয়াছে—ইহারা যাযাবর, উদ্ভিদ বপন ইহারা জানিত না—ইহাদের খাদ্যতালিকায় শাকসবজির স্থান ছিল না। এখন ইহারা কৃষিকার্য করে, নিজেদের স্থায়ী ঘরবাড়ীতে বাস করে এবং ইহাদের জীবনধারা সর্বাংশে উন্নত হইয়াছে।

মেরু অঞ্চলে কৃষির উপযোগী ভূমির পরিমাণ ১৯২৬ হইতে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ৩৩ গুণ বর্ধিত হইয়াছে। এই সকল সাফল্যের মূলে রহিয়াছে দেশের পরিপার্শ্বকে উদ্ভিদের অনুকূল

করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা। যে মাটিতে, যে আবহাওয়ায় যে শস্য জন্মাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না সেখানে সেই শস্য জন্মাইবার ব্যবস্থা যেন এখন বিজ্ঞানীর হাতের মুঠোর মধ্যে। পর্বতশৃঙ্গ, তুষারক্ষেত্র, গহণ অরণ্য, সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক কৃষি অভিযান করিতেছে। রাশিয়ার কিউবান অঞ্চলে আজকাল চাউল এবং উত্তর ককেশাস ও ইউক্রেণ অঞ্চলে তুলার চাষ হইয়া থাকে। ৪৮° উত্তর অক্ষাংশ অঞ্চলে (শীত প্রধান প্রদেশ) পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই তুলার চাষ সম্ভব হয় নাই—সোভিয়েট রাশিয়া তাহাতেও সাফল্য লাভ করিয়াছে। আজেরবাইজান ও তুর্কেমিয়ায় নূতন ধরণের মিশরীয় তুলার চাষ হইতেছে। লম্বা আঁশওয়ালা আমেরিকান তুলা আজকাল রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতের আলুর উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে যাহাদের বিভিন্ন গুণাবলী রহিয়াছে—কোনটি গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী, কোনটি বা পরজীবী কীটের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, সর্বোপরি সকল জাতের আলুরই ফলনের হার বর্ধিত হইয়াছে। রাশিয়ায় বীট হইতে চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে, এখন সেখানে নূতন ধরণের একপ্রকার বীট উৎপন্ন করা হইতেছে যাহাতে চিনির ভাগ বেশী থাকে। এই প্রকার সকল কৃষিরই উন্নতি করা হইয়াছে। আবহাওয়া, মাটি, শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিবিধ খেয়ালকে জয় করিয়া মানুষ আজ শস্যোৎপাদনকে একান্তভাবে স্বীয় করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছে। উদ্ভিদের সুপ্রজনশাস্ত্র (Genetics), প্রাকৃতিক নির্বাচনরীতি (Natural Selection) ও বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম বিষয়ক গবেষণাদ্বারা এই সকল সাফল্য সম্ভব হইয়াছে। উদ্ভিদের বংশগতিকে মিশ্র মিলনদ্বারা পরিবর্তিত করান ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্রমে

সহনীয় করিয়া তোলা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করানই এই জাতীয় গবেষণার লক্ষ্য।

ভাভিলোভ নামক বিজ্ঞানী বলেন—কৃষিকার্যের অনধিগম্য কোন সীমান্ত নাই—পৃথিবীর যেখানে মাটি আছে কৃষি সেখানেই সম্ভব।

কৃষিকে জৈব উপদ্রব হইতে রক্ষা করা কৃষিবিজ্ঞানের অন্যতম কার্য। নানাজাতীয় কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের বীজ, গাছ, পাতা, ফল-মূলকে ধ্বংস করে এবং শস্যে মড়ক লাগায়। সোভিয়েট গবেষণাগারে নানাপ্রকার ব্যবস্থাদ্বারা এই সকল উপদ্রব নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ ও বহু প্রকার পরজীবী কীটাণুদ্বারা শস্যের শত্রুকে বিনাশ করা হইয়া থাকে।

রাশিয়ার বহু স্থানে স্বাভাবিক অনুর্বর জমি ছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেইগুলির উর্বরতা বাড়ান হইয়াছে। বহু অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পনাহীন গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ করিবার ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হইয়াছিল। এমন অনেক জমি ছিল যাহা এককালে কয়েক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইত, সেই সব জমিতে সার দিয়া বা যথা প্রয়োজন যত্ন লইয়া জমির উন্নতি করার কোন দায় চাষীর থাকিত না, কারণ চাষী জানিত বন্দোবস্তের কাল অন্তে জমিতে তাহার কোন স্বার্থ নাই। এইভাবে বহু জমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তারপর জমিতে সার দিবার ব্যবস্থা পূর্বতন রাশিয়ায় প্রায় বিলাসিতার ব্যাপার ছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীনে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভূমির উন্নতিবিধান এখন রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য। বহুবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখন এই কার্য করা হইয়া থাকে। গবাদি পশুর অবস্থা উন্নত হওয়ায় জমির সার

সহজলভ্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ খনিজ ও কৃত্রিম সার দিবার ব্যবস্থা আছে। এমোনিয়াঘটিত পদার্থ সার হিসাবে ব্যবহার করিবার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জারের আমলে দেশের প্রতি একর জমিতে গড়ে এক চামচ খনিজ সারও দেওয়া হইত না। ব্যাপক খনিজ সার সংগৃহীত হইতেছে বলিয়া এখন এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে দেশের জমিতে যে পরিমাণ সার দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে দশগুণ সার ব্যবহার করা হইয়াছে। সোজাসুজি সার পদার্থ জমিতে দেওয়া ভিন্ন পরোক্ষ উপায়ে জমিতে উদ্ভিদের পক্ষে পুষ্টিকর পদার্থ উৎপন্ন হইবার আরও অনেক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। উত্তর এবং মধ্য অঞ্চলের অম্লরসপ্রধান জমিকে উদ্ভিদের পক্ষে সহনীয় ও অনুকূল করিবার জন্য জমিতে ক্যালসিয়ম ঘটিত পদার্থ সংযোগ এই ব্যবস্থার অন্যতম। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বহু অনাবাদী জমিতে জীপসাম নামক খনিজ পদার্থ প্রয়োগে উহাকে চাষের উপযোগী ও উর্বর করা হইতেছে।

কৃষ্ণমৃত্তিকার সমভূমি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাত ও খাল জমিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত। বৎসরের পর বৎসর এই খাতগুলি বড় হইয়া চলিত এবং ক্রমশ চাষের জমি গ্রাস করিত। সোভিয়েট রাষ্ট্রে নিয়মিতরূপে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় দেশকে এই খাতের ধ্বংসকরী উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। জমিতে বৃক্ষরোপণ করিয়া মাটিকে শক্ত করা হয় এবং ইহাতে খাত সৃষ্টি বন্ধ হইয়া থাকে।

বালুকাভূমির উৎপাতও রাশিয়ার কম সমস্যা নহে। বাত্যাবাহিত বালুকারাশির নীচে চাপা পড়িয়াছে কত শস্যক্ষেত্র, মরূদ্যান, গ্রাম ও

জনপদ। মরুরাক্ষসীর সর্বনাশা গ্রাস হইতে রাশিয়া আজকাল আত্মরক্ষা করিতে শিখিয়াছে। এরোপ্লেনের সাহায্যে মরুভূমিতে তৃণগুল্মাদির বীজ বপন করা হইয়া থাকে—ইহাতে বালুকাভূমি সুদৃঢ় হয়।

নবোদ্ভাবিত 'ব্যাকটিরিয়া' সার সোভিয়েট কৃষির অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদার্থ। মটরশুটি জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ আছে উহারা বাতাস হইতে খাদ্যহিসাবে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার জন্য মূলে কতকগুলি গুটিকাতে একজাতীয় ব্যাকটিরিয়া পোষণ করে। উদ্ভিদেরা নিজে বাতাসের নাইট্রোজেনকে আত্মস্থ করিতে পারে না, কিন্তু ব্যাকটিরিয়াগুলি বাতাস হইতে নাইট্রোজেন মুক্ত করিতে সমর্থ। এইরূপ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যবর্তিতায় বাতাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের দেহে স্থান পায়। ব্যাকটিরিয়া-সার রূপে পরিচিত 'নাইট্রাজিন' ও 'এজোটেজেন' উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি উদ্ভিদের খাদ্যব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার (Dieting) উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপযুক্ত কালে গাছকে বিভিন্ন সময়ে যথাপ্রয়োজন খাদ্যপ্রদান করিলে গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। আজকাল ব্যাপকভাবে এই উপায়ে গাছের পরিচর্যা করাতে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত হইয়াছে।

পামীরের মালভূমিকে কৃষির উপযোগী করিয়া তোলা সোভিয়েট বিজ্ঞানের অসামান্য কৃতিত্বের অন্যতম দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে মাত্র দশমাইল দূরবর্তী তাজিকস্থান রিপাব্লিকের পূর্বাংশের নাম পার্বত্য বাদাকস্থান। এতদঞ্চল পামীরের মালভূমির অন্তর্ভূত এবং

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা আট হাজার থেকে ষোল হাজার ফুট পর্যন্ত।

সোভিয়েট শিল্প-জাগরণের ফলে এই অঞ্চলে লৌহ, স্বর্ণ, পীট, কোয়ার্টজ, মলিবডেনাম, টাঙস্টেন প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। খনিজ শিল্পকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও কৃষির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিরন্তন ঊষর পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি যে আদৌ সম্ভব একথা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারিত না।

সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ এই অঞ্চলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—এতদ্দেশের মৃত্তিকা লবণ ও পাথরের কুচিতে ভরা। শস্যাদি ফলমূল এখানে কিছুই জন্মে না। বৃক্ষ এমন কি তৃণখণ্ডও এখানে বিরল। এই পার্বত্য মরুভূমিতে জনমানবের চিহ্ন নাই।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মার্কো পোলো বলেন—পামীরের মালভূমির উপর ঘোড়ায় চড়িয়া ক্রমাগত বার দিন চলিয়া আসিলেও একটুকরা সবুজ ঘাস পর্যন্ত চোখে পড়িবে না—জনমানব ত দূরের কথা। এই ভূখণ্ড এত উচ্চে অবস্থিত এবং এত ঠাণ্ডা যে এখানে পাখী পর্যন্ত উড়িতে দেখা যায় না। এতদ্দেশে আগুনের উত্তাপ এবং ঔজ্জ্বল্যও কম মনে হয়।

এই অঞ্চলের পূর্বভাগের বাতাস অতিশয় শুষ্ক। ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার। সাধারণ নিয়মে উচ্চ পার্বত্য প্রদেশে বৃষ্টির আধিক্য থাকাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু পামীরের পূর্বার্ধে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ আড়াই ইঞ্চির চেয়ে বড় বেশী হইতে দেখা যায় না। এখানকার এই বৈচিত্র্যের কারণ কি? এই ভূভাগের চতুর্দিকেই উচ্চ পর্বত শ্রেণী

রহিয়াছে। পর্বতমালার শিখরদেশ নিরন্তর তুষারাচ্ছন্ন থাকে। সেখানে তাপ ও বায়ু প্রবাহিত চাপ উভয়ই কম। ইহার ফলে এই স্থান দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার জলীয় বাষ্প বরফের উপর জমাট বাধে। সেইজন্য পামীরের মালভূমিতে যে বাতাস পৌঁছায় তাহাতে জলীয় বাষ্প কমই থাকে।

জলীয় বাষ্পের অভাব ব্যতীত ওখানকার বাতাসের আরও বৈশিষ্ট্য আছে। বাতাসে কারবন-ডায়কসাইডের পরিমাণ সাধারণ অবস্থার শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র। জলীয় অংশ অপ্রতুল বলিয়া এখানকার মাটিতেও জৈব উপাদান কম। কোন প্রাণীর মৃতদেহ মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে উহা শুকাইয়া যায়, কিন্তু পচে না। মাটিতে জলের ভাগ কম বলিয়াই এই প্রকার ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। এইজন্য মাটির জৈব উপাদান আত্মস্থ করিবার ক্ষমতা কম।

এই সব কয়টি কারণই উদ্ভিদ-জীবনের প্রতিকূল। পামীরের পার্বত্য প্রদেশে উদ্ভিদ জন্মাইবার সম্ভাবনার কথাও সেইজন্য বহুকাল পর্যন্ত কেহ চিন্তা করে নাই। কিন্তু সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই আবহাওয়ার ভিতরেও কৃষিকার্য সম্ভব করিয়াছেন।

পামীরে বাতাসে জলীয় বাষ্প ও ধূলি কম থাকার জন্য এখানে সৌর তাপ প্রখর। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে বোধ হয় এত বেশী সূর্যকিরণ পতিত হয় না। কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিদারুণ ঠাণ্ডা, এমন কি বরফ পড়িতেও বিলম্ব হয় না। জলীয় বাষ্প ও ধূলি দ্বারা সূর্যতাপ শোধিত হয় না বলিয়া দিবাভাগে সূর্যকিরণ প্রখর, আবার রাত্রিকালে উত্তপ্ত ভূভাগ হইতে তাপের বিকিরণে বাধা দিবার জন্য বাতাসে জলীয় বাষ্প বা ধূলি নাই বলিয়াই

সূর্যাস্তের পরেই আবহাওয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসে। এই প্রকার প্রাকৃতিক বৈসাদৃশ্যের ভিতর কৃষি কি সম্ভব ?

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ব্যাপক ও শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, যে-সকল উদ্ভিদ খুবই দ্রুত জন্মে তাহারাই এতদ্দেশে টিকিয়া থাকিবার উপযোগী। প্রথমত শীতের অঞ্চলের উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় নাই। তারপর আরব, প্যালেস্টাইন ও আবিসিনিয়ার সমুদ্র সমতলের উদ্ভিদ লইয়া দেখা গিয়াছে যে ঐগুলি পামীরে বাঁচিয়া থাকে। শুধু তাই নয়, এখানে যে শস্যাদি জন্মান হইয়াছে তাহাতে ভিটামিন-সি ও শর্করার ভাগ বেশী থাকে। কি করিয়া এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে ?

মে মাসে বীজ বপন করা হইত—তখনও রাত্রিতে প্রচণ্ড শীত। কিন্তু দেখা গেল এমনি আপাত-প্রতিকূল পরিপার্শ্বেও বীজ হইতে চারা জন্মিতেছে এবং সেই চারাগুলি দুঃসহ শীতেও মরিয়া যাইতেছে না। উহাদেরই সমগোষ্ঠীর উদ্ভিদেরা কিন্তু স্ব স্ব অঞ্চলে এতটা শীত সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, পামীরের শীতে উহারা টিকিয়া রহিল।

দেখা গেল, দিবাভাগে তাপাধিক্যের জন্য উদ্ভিদেরা যে হারে কারবন-ডায়কসাইড গ্রহণ করে তাহা অন্যস্থানের উদ্ভিদের চেয়ে বেশী এবং ইহার ফলে উদ্ভিদ-জীবনে বাতাসের কারবন-ডায়কসাইডের স্বল্পতার বিপত্তি দূরীভূত হয়। মাটি যখন উত্তপ্ত হয় সেই সুযোগে উদ্ভিদ মাটি হইতে বেশী পরিমাণে জল শোষণ করিতে সক্ষম হয়। সেই জলের ভিতরে গাছের খাদ্য খনিজ পদার্থগুলিও বেশী দ্রবীভূত থাকে। সূর্যকিরণের প্রাচুর্যের জন্য উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া ভাল এবং দ্রুত চলে যাহার ফলে গাছের দেহে বিশেষ করিয়া শর্করার

আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার ক্রিয়া এতদঞ্চলেরই একক বৈশিষ্ট্য এবং সূর্যতেজের প্রখরতাই ইহার প্রত্যক্ষ হেতু।

রাত্রিবেলায় আসে দুরন্ত শীত। গাছের তখন শ্বাসক্রিয়াই প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। শ্বাসকার্য মৃদু হইবার জন্য দেহের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ থাকে, শর্করা তখন আর স্টার্চে রূপান্তরিত হয় না। পক্ষান্তরে উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরীণ শর্করা সম্পদের বৃদ্ধির জন্যই উদ্ভিদ শৈত্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণা ও প্রচেষ্টার ফলে এখন পামীর অঞ্চলে কৃষিকার্যের প্রচলন হইয়াছে। বাদাকস্থানে এক শতটি যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান আছে। এখানকার এক একটি কৃষিক্ষেত্রে প্রতি একরে পনর থেকে পঁচিশ টন আলু জন্মিয়া থাকে। দশহাজার ফুট উর্ধ্বেও এখন আলু জন্মে। ঐ দেশের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে আঙ্গুরের চাষও করা হইতেছে।

বিবিধ প্রকার ফসল জন্মাইবার জন্য মাটিতে জৈব উপাদান দরকার। এই জন্য কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন আবশ্যক। এই বিষয়ে ব্যবস্থা হইতেছে।

অনাবাদী ও অনুর্বর জমি সোভিয়েট রাশিয়ায় শীঘ্রই লুপ্ত হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির ত্রুটি সংশোধিত হইতেছে।

তারপর কৃষিযন্ত্রের কথা। জারের আমলে রাশিয়ায় কৃষিযন্ত্র বলিলে বুঝাইত এক খণ্ড কাঠের লাঙল যাহার সাহায্যে কোন রকমে মাটিতে আঁচড় কাটা যাইত। কিন্তু এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, সোভিয়েট

য়ুনিয়নে প্রায় পাঁচ লক্ষ ট্রাক্টর চলিত। যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সহজ হইয়াছে। কলের লাঙলে মাটিতে নয় দশ ইঞ্চি গভীর চাষ করা সম্ভব। যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রে অনেক বেশী নিড়ানী দেওয়া যাইতে পারে। কৃষির উন্নতি ও কৃষকের সুবিধার জন্য নানাপ্রকার যন্ত্রচালিত কৃষি-উপাদান নির্মিত হইয়াছে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্যের জন্য বীজ বপনের কাজে যান্ত্রিক সাহায্য লওয়া হয়। কৃষককে আরাম দেওয়া এবং শস্যকে নির্দোষরূপে ও লাভজনক পরিমাণে সংগ্রহ করার জন্যও কতকগুলি সুবিধাজনক যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। তুলা, আলু, বীট প্রভৃতি প্রত্যেকটি শস্য আহরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক যন্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য সোভিয়েট য়ুনিয়নে চার হাজার ট্রাক্টর স্টেশন আছে। জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিকে যন্ত্রের সাহায্যে কৃষির উপযুক্ত করা হইয়া থাকে। ‘ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর’ নামক যন্ত্র জঙ্গলা গাছের উপর দিয়া চলিয়া যাইবার কালে গাছগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেয়। কলের কাটারী বনের পর বন কাটিয়া পরিষ্কার করিতেছে। অচিরকালমধ্যে বনভূমি রূপান্তরিত হয় চাষের জমিতে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমগ্র ডেনমার্কের কর্ষিত ভূমির দ্বিগুণ পরিমাণ বনভূমিকে চাষের উপযোগী করা হইয়াছিল।

পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা সোভিয়েট য়ুনিয়নে বেশী সংখ্যক কৃষিযন্ত্র নির্মিত হয়। অথচ মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও কাস্তেখানা পর্যন্ত বিদেশ হইতে আসিত। যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জমিতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ পাঁচ সাত গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। একখানা ট্রাক্টর মাত্র দেড় ঘণ্টায় আড়াই একর জমি চাষ করে এবং

ঐ পরিমাণ জমির শস্য আহরণ করে মাত্র আধ ঘণ্টায়। জলাভূমিতে ধানের বীজ বপন করিবার জন্য এরোপ্লেনের ব্যবহারও এতৎসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় উপযোগিতা সপ্রমাণ করিয়াছে। রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা উর্বর অঞ্চল ইউক্রেন ও কিউবান ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে দেশে শস্যাভাব দেখা দেয় নাই। নূতন অঞ্চলে নূতন অকর্ষিত ভূমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার সাফল্যে বিজ্ঞানের দান অসামান্য। নূতন ধরণের বীজ সরবরাহ করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে শস্যোৎপাদন ব্যবস্থাদ্বারা যুদ্ধজনিত শস্যহানির ক্ষতিকে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। শান্তিকালে যে ব্যবস্থাগুলি গবেষণাদ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল আপৎকালে তাহা জাতিকে মহাসংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছে। পনরশত বৈজ্ঞানিক বক্তা ও কর্মী গ্রামাঞ্চলে কৃষককে নানাপ্রকার নূতন কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে নিরন্তর শিক্ষা দিয়াছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সামান্য কৃষকের জীবনের সঙ্গেও বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিত্য যে সংগ্রাম চলিতেছে সোভিয়েট রাশিয়ায় সেই সংগ্রামে কৃষকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বিজ্ঞানী। প্রকৃতির খেয়ালখুসীতে নিত্য যার জীবনে জোয়ারভাটা খেলিয়াছে—কখনও প্রাবৃটের মেঘ-ভার দর্শনে প্রাণে তাহার আনন্দের স্রোত বহিয়াছে, দারুণ অগ্নিবাণে আবার কখনও বা তাহার হৃদয়ের সকল সরসতা উষর মরুতে রূপায়িত হইয়াছে। সেই একান্ত অসহায়, দেশে দেশে উপেক্ষিত, অবজ্ঞায়

শুষ্ক, নিরানন্দ কৃষকের মনোমরুভূমিতে রসের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন সোভিয়েট বিজ্ঞানী দল। তাই জনগণ আজ সেখানে বিজ্ঞানের সৃজনী শক্তিতে মুগ্ধ, বিজ্ঞানের কল্যাণী মূর্তি আজ মাঠে মাঠে উদ্ভাসিত।

'—কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্ম ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন

* *

ওগো গুণী
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার'।

কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে রাশিয়ার স্থান

উৎপন্ন দ্রব্য	১৯২৮,	১৯৩৩	১৯৩৭
গম	২	২	১
বার্লি	২	২	১
তুলা	৫	৪	৩
শণজাতীয় দ্রব্য (ফ্লাকস্)	১	১	১
বীট (চিনির জন্য)	২	২	১
ওটস্	২	২	১

সাত সাগরের জল

সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রধান নগর মস্কৌ—ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে এই স্থান সর্বতোভাবে বড় শহর হইবার উপযুক্ত ছিল না। কোন সুগভীর স্রোতস্বতীর জলধারা মস্কৌ শহরকে বিধৌত করে না, সমুদ্র হইতে মস্কৌ বহু দূরবর্তী; উত্তরে শ্বেত সাগর নয়শত মাইল দূরে, দক্ষিণে কাস্‌পিয়ান সাগর, তাহার দূরত্ব বার শত মাইল। কাছাকাছি রহিয়াছে বল্‌টিক সাগর, তাহাও মস্কৌ হইতে অন্যূন চারিশত মাইল পথ। সমগ্র পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ লইয়া যে বৃহৎ দেশ তাহার প্রধান নগরের অন্তর্বাণিজ্য বা বহির্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কোন জলপথ নাই। অথচ দুই মহাসাগর ও দ্বাদশ সমুদ্র রাশিয়াকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—সমুদ্রোপকূলের দৈর্ঘ্য ২৬৭০৩ মাইল। তদুপরি পাঁচলক্ষ ছোট বড় নদী দেশের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত। এতদ্ব্যতীত একলক্ষ আশী হাজার ছোট বড় হ্রদ আছে। যে দেশে জলের এত প্রাচুর্য সেই দেশের প্রধান নগর মস্কৌ একটি ছোট অগভীর নদীর তীরে অবস্থিত।

খুব সম্ভব পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র নদীটির নাম হইতেই মস্কৌ নগরের নামকরণ হইয়াছিল। বসন্তকালের সূচনায় যখন উত্তর অঞ্চলে বরফগলা আরম্ভ হয় সেই সময় মাত্র স্বল্পকালের জন্য মস্কৌ নদীকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই সমৃদ্ধির পরেই মস্কৌ নদীতে আসে নিদারুণ দৈন্য। বসন্ত শেষ হইতে না হইতেই নদীর প্রায় তিনচতুর্থাংশ জলসম্পদ সাগরে প্রবাহিত হইয়া যায়। তারপর পড়িয়া থাকে

ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতীর ক্ষীয়মান জলধারা, তাহাতে সমগ্র শহরবাসীর পিপাসা নিবারণের জলটুকু মেলাই প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু প্রাকৃতিক কোন বাধাই বিজ্ঞানের কাছে অলঙ্ঘনীয় নহে। প্রকৃতির ত্রুটিকে সংশোধন করাই ত বিজ্ঞানের কাজ! মস্কো শহরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের ও বহির্জগতের সংযোগের অসুবিধা শিল্পবাণিজ্যের প্রসারেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রকট হইয়া পড়িল। মস্কো নদী দিয়া ছোট ছোট জাহাজে বাহিত হইয়া যে পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানী হইত তাহার চল্লিশগুণ মাল চলাচল করিত রেলপথে। অথচ কাঠ, পাথর প্রভৃতি ভারী মাল চলাচলের জন্য রেলপথ কোনক্রমেই সুবিধাজনক নয় এবং সর্বোপরি জলপথে মাল চলাচল সর্বদাই অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাপেক্ষ। মস্কো শহরের নিকটে বড় নদী নাই বটে, কিন্তু রাশিয়ার অন্যতম বড় নদী ভল্‌গা মস্কোএর আশী মাইল উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণে রহিয়াছে ঐ রকম আর এক নদী, ওকা। মস্কো নদীর সঙ্গে ওকা নদীর যোগাযোগ বরাবরই আছে। ওকা আবার মস্কোএর পূর্বে গোর্কী শহরের নিকটে ভল্‌গা নদীতে মিলিত হইয়াছে। জলপথে মস্কো হইতে বাহিরে আসিবার ইহাই ছিল একমাত্র পথ।

মস্কো হইতে আশী মাইল উত্তরে ভল্‌গা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। একটি জলধারা দ্বারা মস্কো-ভল্‌গার সংযোগ থাকিলে শ্বেতসাগর, বল্‌টিক সাগর ও দেশের উত্তরাঞ্চলের সহিত মস্কোএর যোগাযোগ খুবই সহজ হইতে পারিত। কিন্তু এই অঞ্চল দিয়া কোন নদী বা খাল স্বভাবত থাকা সম্ভব ছিল না। উত্তরে ভল্‌গা ও দক্ষিণে ওকা—দুই নদীর জলবিভাজিকার উচ্চভূমিতে অবস্থিত মস্কো অঞ্চল। সেখান হইতে উত্তরে যাইতে হইলে ক্রমশঃ উচ্চভূমি, তারপর আবার

ঢালু দেশ। এই প্রকার জলবিভাজিকা অঞ্চলে সাধারণত কোন নদী প্রবাহিত হইতে পারে না, কারণ নদী চলে ক্রমশঃ নিম্নমুখে। এইরূপ ভৌগোলিক বিশিষ্টতার জন্যই দুইটি বড় নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্বেও মস্কৌ জলসমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত। কিন্তু ভূগোলের ভুল মানুষের হাতে পড়িয়া সংশোধিত হইয়াছে।

ভল্‌গার সঙ্গে মস্কৌ নদীকে সংযোজিত করিয়া দিবার পরিকল্পনা আধুনিক নয়, প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাতন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সম্রাট প্রথম পিটারের উদ্যোগে এমনি একটা প্রস্তাব করা হইয়াছিল। উইলিয়ম হেনিং নামক এঞ্জিনিয়ার যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে, প্রস্তাবিত খালের রাস্তায় তিনদিনে একখানি হালকা (৫০টন) জাহাজ ভল্‌গা হইতে মস্কৌ আসিতে পারে এমন ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত। এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কাগজপত্রে নকসা আঁকিয়া পরিকল্পনা করা ও তাহার বাস্তব রূপদান, ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। তদানীন্তন কালে রাশিয়ার এমন কোন আর্থিক বা বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য ছিল না যাহাতে এইরূপ একটা পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব ছিল। সুতরাং এই প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। তারপর বহুদিন পর্যন্ত এমনি একটা অবাস্তব সম্ভাবনার কথা কেহ আর মনের কোণেও স্থান দেয় নাই।

তারপর গেল একশত বৎসর। সম্রাট প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালে মস্কৌ শহরে 'ক্যাথেড্রাল অফ ক্রাইস্ট দি সেভিয়ার' নামে একটি সুবৃহৎ উপাসনামন্দির নির্মাণ করিবার সংকল্প গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রকার বিরাট বাড়ী নির্মাণ সেই সময়ে খুব সহজ ছিল না। সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা ছিল বাড়ীর জন্য প্রয়োজনীয়

ভারী সাজসরঞ্জাম ও মালমশলাদি আনয়ন করা। নদীপথ ভিন্ন ভারী সরঞ্জাম স্থানান্তরিত করা সম্ভব ছিল না। ভল্‌গা নদীর উত্তরাংশ হইতেই প্রস্তরাদি আনা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সে দেশে জলপথে যাওয়া ব্যয়বহুল দীর্ঘ দিনের ব্যাপার। বহু জল্পনাকল্পনার পর মস্কৌ-ভল্‌গা খাল কাটিবার পরিকল্পনা পুনরায় উত্থাপিত হইল। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য এবারকার প্রস্তাব প্রথম বারের পরিকল্পনা হইতে অন্য প্রকার করা হইয়াছিল। প্রথম বারের পরিকল্পনায় এঞ্জিনিয়ারিং-নিপুণতার ব্যাপার ছিল, কারণ নিম্নভূমি হইতে নদীকে উচ্চভূমিতে প্রবাহিত করিবার প্রয়োজন ছিল। এইবার মস্কৌ নদীর উপনদী ইস্‌ট্রা ও ডুব্‌না নদীর উপনদী সেস্‌ট্রাকে সংযোগ করিয়া এক খাল কাটিবার প্রস্তাব করা হইল। মস্কৌ নদী হইতে ইস্‌ট্রা, ইস্‌ট্রা হইতে প্রস্তাবিত খাল পথে সেস্‌ট্রা এবং সেখান হইতে ডুব্‌না দিয়া ভল্‌গায় যাওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব ছিল। এই খালের কার্যও আরম্ভ হইল, কিন্তু সুদীর্ঘ উনিশ বৎসরকাল কাজ চলিবার পরে যখন মস্কৌ হইতে সেন্টপিটার্সবার্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাড) পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইল সেই সময় খাল কাটার কার্য পরিত্যক্ত হইল। কারণ অনেকেই এই মত প্রচার করিলেন যে প্রস্তাবিত জলপথের বাণিজ্য রেলওয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারিবে না। তাই খাল কাটা মধ্যপথে বন্ধ হইয়া গেল; সমস্ত সাজসরঞ্জাম, মালমসলাদি নীলামে বিক্রীত হইল। তারপর আবার গেল একশত বৎসর—মস্কৌ-ভল্‌গা খালের কথা বিস্মৃতির গর্ভেই বিলীন হইয়া রহিল।

রেলওয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জলপথের প্রসার ও প্রচলন যেভাবে কোণঠাসা হইয়া আসিতেছিল উপরোক্ত ঘটনা তাহার

নদী ও খাল

(রুশিয়া)

খাল xxxx নদী ~~

উত্তর মহাসাগর
শ্বেত সাগর
স্টালিন খাল
(শ্বেতসাগর-বালটিক সাগর)
ওনেগা হ্রদ
স্বিরনদী
বালটিক সাগর
লেনিনগ্রাড
ভলগা বালটিক খাল
ভালদাই পাহাড়
ভলগা নদী
মস্কো সাগর
গোর্কী
ভলগা নদী
মস্কো
মস্কো ভলগা খাল
ওকা নদী
ভলগা
নীপার নদী
বাঁধ
(নীপার)
ডন নদী
স্টালিনগ্রাড
ভলগা নদী
আজভ সাগর
ডন-ভলগা খাল
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর



অন্যতম নিদর্শন। পূর্বতন রাশিয়ায় এমনি করিয়াই জলপথের বাণিজ্য ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাশিয়াতে কয়েকটি বড় নদী রহিয়াছে, অথচ নদীর সমগ্র দৈর্ঘ্যের মাত্র একচতুর্থাংশে নৌবাণিজ্য চলিত। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় দেশের বিভিন্ন শিল্প বা বাণিজ্যের ভিতর কোন প্রতিযোগিতার স্থান নাই। রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় দেশের সকল যানযাহন ও চলাচল বিভাগ একই সূত্রে গ্রথিত। শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র প্রয়োজনানুসারে যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে বলিয়াই সেখানে প্রতিযোগিতার কোন প্রশ্ন উদিত হয় না। দেশের নানাস্থানে নূতন শিল্প বা কৃষি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মস্কৌ শহরের নৌ-বাণিজ্যিক অসুবিধা বেশী করিয়া অনুভূত হইল। তাই স্টালিনের উদ্যোগে সোভিয়েট রাষ্ট্র দুইবার পরিত্যক্ত পরিকল্পনাকে পুনরায় কার্যকরী করিবার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় রত হইল।

এই পরিকল্পনাকে বাস্তবীকরণে বাঁধার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। ভল্‌গা হইতে মস্কৌ নদী আশী মাইল দূরে, মাঝখানে রহিয়াছে অরণ্য, পাহাড়, প্রান্তর ও উচ্চভূমি। ভল্‌গা ও মস্কৌএর জলবিভাজিকার উচ্চভূমির উপর দিয়া জলস্রোতকে প্রবহমান করা স্বাভাবিক উপায়ে সম্ভবে নহে। কিন্তু তবুও সোভিয়েট বিজ্ঞান বিভাগ এমনি একটা অসম্ভব ব্যাপারকেও বাস্তব রূপ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ভাল্‌দাই পাহাড়ে ভল্‌গা নদীর উৎপত্তি। সেখান হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া ভল্‌গা খানিকটা পথ পূর্বদিকে চলিয়াছে। মস্কৌ শহরের আশী মাইল উত্তরে আইভানোভ গ্রামের কাছে ভল্‌গা নদীতে বাঁধ দিয়া উহার

পূর্বাভিমুখী গতিকে মন্দীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীর জলপ্রবাহ ঐ অঞ্চলের চতুর্দিকে ছড়াইয়া গিয়া সেখানে একটা বিরাট হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কৃত্রিম হ্রদের নাম দেওয়া হইয়াছে 'মস্কো সাগর'। একদা যাহা নদী ছিল এখন তাহা বাস্তবক্ষেত্রে সাগরে পরিণত হইয়াছে। এই অঞ্চলে বহুকাল হইতে বসন্ত সমাগমে বেগবতী নদীর স্রোতধারা জনপদ-প্রান্তর প্লাবিত করিয়া উদ্দাম কল্লোলে প্রবাহিত হইত, কিন্তু বসন্তের অন্ত হইলে সেখানে নদীতে চড়া জাগিয়া উঠিত এবং তখন ভল্গা নৌচলাচলের অযোগ্য হইয়া থাকিত। জলরাশির এই বিরাট অপচয়কে রোধ করিবার জন্য বিস্তৃত ভূখণ্ড (১২৬ বর্গ মাইল) জুড়িয়া বাঁধ দেওয়া হইয়াছে এবং জনপদ, অরণ্য ও মাঠের মাঝে 'সাগরের' জন্ম হইয়াছে। এক্ষণে কে বলিবে ইহা কৃত্রিম সমুদ্র। বহুসংখ্যক সমুদ্রগামী জাহাজের বংশীধ্বনি মুখরিত এই জলরাশি তরঙ্গ তুলিয়া কূলে আছড়াইয়া পড়িতেছে। এই 'সমুদ্র' হইতে বাহিরে যাইবার তিনটি পথ। ভল্গা নদীর উজান জলস্রোত অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে যে জলপথ বহির্গত হইয়াছে তাহারই শেষপ্রান্তে ভল্গার বাঁধ হইতে পচাত্তর মাইল দূরে ক্যালিনিন সহর। ভল্গার পূর্বতন স্রোতধারা প্রবাহিত হইয়াছে পূর্বদিকে—এই পথে বাঁধের ভিতর দিয়া নিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহ চলিতেছে। সেই পথে চলিলে যাওয়া যায় গোর্কী সহরে এবং তথা হইতে ভল্গা নদীর মোহনা ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত। এই পথেই আবার পূর্বদিকে না যাইয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইলে পাওয়া যায় ওনেগা হ্রদ। ওনেগার পথেই রহিয়াছে শ্বেত সাগর কিম্বা লেলিনগ্রাড হইয়া বল্টিক সাগরে যাইবার ব্যবস্থা।

মস্কো সাগর হইতে তৃতীয় যে জলপথ দক্ষিণে গিয়াছে উহাই মস্কো-ভল্‌গা খাল—এঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের চরম নিদর্শন। ভল্‌গার জলপ্রবাহ বাঁধে আটকাইয়া স্ফীত হইয়া উঠে—সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই জলরাশির উচ্চতা ৫৮৫ ফুট। কিন্তু এত উঁচুতে উঠিয়াও এই জলরাশি ভল্‌গার জলবিভাজিকাকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। এই জলরাশিকে মস্কো পর্যন্ত চালিত করিতে হইলে ইহাকে আরও ১২৫ ফুট ঊর্ধ্বে তুলিতে হইবে। ভগবৎ-প্রসাদে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের চেষ্টায় নদী ও জাহাজ যে পাহাড় অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ভল্‌গা নদী তথা 'মস্কো সাগরের' জলকে ১২৫ ফুট ঊর্ধ্বে তুলিবার জন্য 'জলের সিঁড়ি'র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাঁচ ধাপে নদীর বিরাট জলরাশিকে ১২৫ ফুট ঊর্ধ্বে উঠান হইতেছে। বিভিন্ন ধাপের উচ্চতা ১৯·২ হইতে ২৬·২ ফুট পর্যন্ত। বিভিন্ন উচ্চতায় ধাপে ধাপে পাঁচটি খাল বা জলাধার আছে। ভল্‌গা নদীর জলকে অতিকায় পাম্প যন্ত্রের সাহায্যে একটার পর একটা খালে উঠান হইয়া থাকে। এই সকল পাম্প যন্ত্রের আকৃতি ও কার্যক্ষমতা অপরিমেয়। যে নল দিয়া জল চলে তাহার ব্যাস এত বিস্তৃত যে উহার ভিতর দিয়া বড় বড় মোটর ট্রাক অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকটি পাম্প দ্বারা প্রতি সেকেণ্ডে ৫২০০ গ্যালন জল ২৬ ফুট পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উঠান হইয়া থাকে। পৃথিবীর কুত্রাপি এত বৃহৎ পাম্প ব্যবস্থা নাই। এমনি করিয়া ধাপে ধাপে খাল উঠিয়া গেল ১২৫ ফুট ঊর্ধ্বে। কিন্তু পাম্প করিয়া এক জলাধারের জল অন্য জলাধারে উঠান হইলেই খাল কাটার সকল প্রয়োজন শেষ হয় না।

খালকে নৌচলাচলযোগ্য করিতে হইলে পাম্পের সাহায্যে চলিবে না।

বিভিন্ন উচ্চতার খালের একটির সঙ্গে অপরটির যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে 'লক-গেট'র ব্যবস্থা আছে। এক খাল হইতে অন্য খালে চালান করিবার জন্য জাহাজকে 'লক' বা একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হয়। তারপর এই প্রকোষ্ঠের জলের পরিমাণ বাড়াইয়া জাহাজকে বেশী উচ্চতায় তোলা সম্ভব। উঁচুতে উঠিবার পর পার্শ্ববর্তী উঁচু খালের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং জাহাজ উপরের খালে স্থানান্তরিত হয়। আবার অনুরূপ ব্যবস্থার দ্বারা 'লক'এর জল নামাইয়া জাহাজ নীচেও নামাইয়া আনা যায়। এমনি পাঁচটি লকের সাহায্যে 'মস্কো সাগরের' জাহাজ ১২৫ ফুট উর্ধ্বে উঠিয়া আবার দক্ষিণ দিকে মস্কো অভিমুখী হইবার পথে নীচে নামিয়া আসে। এই প্রকার লকগুলি ফেরোকংক্রিটের তৈয়ারী বৃহৎ জলাধার মাত্র। প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে ৯৫০ ফুট এবং প্রস্থে ৯৮·৪ ফুট।

পাম্পের সাহায্যে ভল্‌গার জলধারা উর্ধ্বে উঠিয়া তারপর আবার নিম্নভূমি দিয়া চলিতে থাকে। এখন আর কোন অসুবিধা নাই, কারণ জলের স্বাভাবিক ধর্মানুসারেই জল নীচে নামিয়া আসিবে। কিন্তু জলস্রোত যে-কোন পথে জলপ্রপাতের মত নীচে নামিয়া আসিলেই চলিবে না। জলরাশিকে নদীপথে প্রবাহিত করিয়া উহাকে নৌচলাচলের পথ হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। এখানেও আবার এক অভিনব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মস্কো হইতে এই স্থান পর্যন্ত ইতিপূর্বে কতকগুলি ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হইত। এই নদীগুলিতে বাঁধ দিয়া উহার জলপ্রবাহকে

আটকাইয়া দেওয়ার পর নদী রূপান্তরিত হইল হ্রদে। মস্কো পর্যন্ত সমস্ত পথের স্থানে স্থানে এমনি অনেকগুলি হ্রদ সৃষ্টি করিয়া হ্রদ-গুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল দ্বারা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক হ্রদ হইতে অপর হ্রদ হয়ত খানিকটা উঁচুতে। সেখানেও লকগেটের ব্যবস্থা। এমনি করিয়া ক্ষুদ্রপরিসর খালের পথে ভল্‌গার জলপ্রবাহ ও সেই জলপথে জাহাজ একটির পর একটি হ্রদ অতিক্রম করিয়া ক্রমে নিম্নভূমিতে নামিয়া আসে। এই পথের একস্থানে খালের নীচ দিয়া সেস্‌ট্রা নদী নলের ভিতরে প্রবাহিত হইয়াছে।

মস্কো-ভল্‌গা খাল ৭৯·৫ মাইল দীর্ঘ, ১৮ ফুট গভীর এবং ২৮০·৪ ফুট প্রশস্ত। কৃত্রিম খালের এত বেশী গভীরতা সচরাচর দেখা যায় না। এই খাল দিয়া পাশাপাশি দুইখানা বৃহদাকার জাহাজ একই সঙ্গে যাতায়াত করিতে পারে। তিন তলা যাত্রীবাহী জাহাজ ও ১৮ হাজার টন মালবাহী জাহাজ এই খাল দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে বাঁধ দিয়া যে-সকল কৃত্রিম হ্রদ তৈয়ারী করা হইয়াছে এখন আর ঐগুলিকে মানুষের হাতেগড়া ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বৃক্ষলতাদি পরিবেষ্টিত, হ্রদের জলে জলচর পাখীরা আনন্দে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের কাকলি-মুখরিত জলাশয়ের পার্শ্ব দিয়া চলিতে চলিতে কখনই মনে হয় না একদা এই সকল স্থান বিস্তীর্ণ স্থলভাগ ছিল। হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে যাইবার সময় খালের প্রস্তরবাঁধান দুই কূলের উপরে লক্ষ্য পড়িলেই মাত্র বুঝা যায় যে এই জলপথ মানুষেরই সৃষ্টি, প্রকৃতির দান নহে।

এমনি একটা কৃত্রিম হ্রদের আয়তন প্রায় ৮০০ কোটি ঘনফুট।

এই খালপথে বাহিত ভল্‌গার জলেই মস্কৌ শহরের পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে। উকানস্ক জলাধারের জল ১৭ মাইল কংক্রিটের পাইপ বাহিত হইয়া মস্কৌ এর স্টালিন ওয়াটার-ওয়ার্কসে নীত হয়।

'মস্কৌ সাগরে' প্রায় ৪০০০ কোটি ঘনফুট জল সঞ্চিত থাকে ; উহা হইতে এই খালের পথে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫৩০ ঘনফুট জল প্রবাহিত হইয়া থাকে। নানা জলাধার ও জলাশয় ঘুরিয়া এই জলরাশি ক্রেমলিনে আসিয়া মস্কৌ নদীতে পতিত হয়। ইহার ফলে বিশীর্ণ মস্কৌ নদীতে নূতন জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছে এবং উহার জলের উচ্চতা ১০ ফুট বর্ধিত হইয়াছে। একদা যে নদী মোটেই নৌবাহন-যোগ্য ছিল না, সেই নদীপথে এখন বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করে। মস্কৌ নদী দিয়া জাহাজ আসিয়া পড়ে ওকা নদীতে। ওকা নদীর পথে অগ্রসর হইলে গোর্কীতে আসিয়া আবার ভল্‌গা নদী পাওয়া যায়। ভল্‌গার জল আবার ভল্‌গাতেই আসিয়া মিশিয়া যায়। ভল্‌গা নদী অতঃপর কাস্‌পিয়ান সাগরে পতিত হইয়াছে। মস্কৌ-ভল্‌গা খাল খননের ফলে মস্কৌ হইতে কাস্‌পিয়ান সাগরে জাহাজ চলাচল সম্ভব হইয়াছে।

মস্কৌ খালের ৮০ মাইল পথের ভিতরে চমকপ্রদ এঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের পরিচায়ক দুইশত সুবৃহৎ ব্যাপার বিদ্যমান আছে। ইহাদের ভিতর এগারটি কংক্রীট নির্মিত লক বা জলপ্রকোষ্ঠ, চৌদ্দটি বাঁধ তন্মধ্যে এগারটি মৃত্তিকানির্মিত ও তিনটি কংক্রীটের, উনিশটি সেতু, পাঁচটি পাম্পিং স্টেশন ও আটটি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্টেশন আছে। হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্টেশন অর্থাৎ জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা কৃত্রিম খাল খননের পরোক্ষ ফল ও জাতীয়

সম্পদবৃদ্ধির কারণ। এই খাল খননের জন্য মোটামুটি ২৬ কোটি ঘন গজ মাটি খনন করিতে হইয়াছে। এই কাজে সাড়ে আট লক্ষ টন সিমেন্ট, একানব্বই লক্ষ ঘন গজ প্রস্তর এবং এগার কোটি ইট দরকার হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পানামা খাল কাটিতে সময় লাগিয়াছিল বার বৎসর, কিন্তু মস্কৌ-ভল্‌গা খাল কাটা শেষ হইয়াছে চারি বৎসর আট মাস সময়ে। সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির উৎকর্ষই এই অভাবনীয় সাফল্যের মূল কথা। খাল খননের যাবতীয় কার্যই প্রায় যন্ত্রের সাহায্যে করা হইত এবং এই সকল যন্ত্রের প্রত্যেকটি সোভিয়েট রাশিয়ার নিজস্ব কারখানায় তৈয়ারী। এই খালের কার্যের জন্য নূতন রেলপথ তৈয়ারী করা হইয়াছিল, সেখানে ১৬০ খানা এঞ্জিন ও ২১০ খানা মোটর-রেলগাড়ী ব্যবহৃত হইত। ২৭৪০ মাইল লম্বা টেলিগ্রাফ লাইন বসান হইয়াছিল এবং ৩২০০ টেলিফোন ও ২২টি টেলিগ্রাফ স্টেশন ছিল।

এই বিরাট কার্য ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ বৎসর ২রা মে এক নৌ-বহর 'মস্কৌ সাগর' হইতে যাত্রা করিয়া খালের পথ অতিক্রমপূর্বক মস্কৌএর উত্তরাংশে খিমকী জলাশয়ের উপরে নির্মিত বন্দরে আসিয়া প্রথম নোঙর করে। সেদিন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে এক নূতন জয়স্তম্ভ নির্মিত হয়।

মস্কৌ-ভল্‌গা খাল খননের ফলে মস্কৌ শহরের সঙ্গে অন্ততঃ চারিটি সাগরের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ওকা নদীর পথে গোর্কী হইয়া মস্কৌ হইতে কাস্‌পিয়ান সাগরে যাওয়া সম্ভব। এই নূতন জলপথে মস্কৌ-গোর্কীর দূরত্ব ৬৮ মাইল কমিয়া গিয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাডের অদূরে ৬৫ মাইল লম্বা এক খাল

কাটিয়া ডন নদীর সঙ্গে ভল্‌গার সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। ডন নদীর পথে আজও সাগরে পৌঁছান যায়। 'মস্কো-সাগর' হইতে ভল্‌গা নদী দিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া বামদিকে ঘুরিয়া কিছুদূর গেলে পাওয়া যায় ভল্‌গা-বল্‌টিক খাল। এই খাল ওনেগা হ্রদে যাইয়া পতিত হইয়াছে। ওনেগা হ্রদ হইতে উত্তর দিকে বাহির হইলে স্ট্যালিন-বল্‌টিক-শ্বেতসাগরের খালের ভিতর দিয়া শ্বেতসাগরে উপনীত হওয়া যায়। আবার ওনেগা হ্রদ হইতে স্বির নদীর পথে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে লেনিনগ্রাড ও বল্‌টিক সাগরে পৌঁছান যায়। এই রাস্তায় মস্কো হইতে লেনিনগ্রাডের দূরত্ব জলপথে ৬৮৫ মাইল কমিয়াছে। দশ বৎসর আগেও মস্কো শহরের সঙ্গে কোন সমুদ্রের কার্যকরী যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু মস্কো-ভল্‌গা খাল কাটিবার পর একই সঙ্গে মস্কো অন্ততঃ চারিটি সাগরের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে এই প্রকার খাল খনন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে মস্কো শহরের সঙ্গে সব কয়টি সাগরের যোগসূত্র স্থাপনা করা হইবে বলিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে। নদীতে নদীতে সংযোগ স্থাপন দ্বারা এক্ষণে এক সাগরের জল অন্য সাগরে প্রবাহিত হইতেছে।

মস্কো-ভল্‌গা খাল সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক সিদ্ধির অন্যতম নিদর্শন। এমনি আরও বহুসংখ্যক খাল খনন করা হইয়াছে; তন্মধ্যে তিনটির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্বেতসাগর ও বল্‌টিক সাগরের সংযোগকারী স্টালিন খাল নির্মিত হইয়াছে। এই খাল (১৪১ মাইল) পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম। কেরেলিয়া পার্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়া এই খাল কাটাইবার পর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের কৃষিপ্রধান

প্রদেশের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। এই সংযোজনার বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রহিয়াছে। পূর্বে মুরমানস্ক রেলপথে এই দুই অঞ্চলের পণ্যবিনিময় হইত, কিন্তু ক্ষুদ্র রেলপথের পক্ষে এতদ্দেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ স্থানান্তরকরণ প্রায় অসাধ্যই ছিল। একদা পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়া এখানে খাল খনন করিবার কথা কেহ ভাবিতেও পারে নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় এই ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে। এই খাল ঐ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। পূর্বতন নদী শুকাইয়া গিয়াছে। জলপ্রবাহের রীতি বদলাইয়াছে, তাহারই ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন ওখানে জলস্রোতের শক্তিতে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে ঐ প্রদেশের কাঠের কারখানা, খনিজ শিল্প প্রভৃতি অল্পব্যয়ে চালান সম্ভব হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ভল্‌গা-বল্‌টিক খাল, ও ভল্‌গা-ডন খাল খননের পর কৃষ্ণসাগর, কাস্‌পিয়ান সাগর, বল্‌টিক সাগর ও শ্বেতসাগরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহারই ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যব্যবস্থার এবং কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

য়ুরোপের দীর্ঘতম নদী ভল্‌গা এবং এই নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই সোভিয়েট রাশিয়ার তিন চতুর্থাংশ লোকের বাস। ভল্‌গা নদী গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় বলিয়া সেই সময় ইহাতে নৌচলাচলের অসুবিধা হয়। এই নদীর জলস্রোতকে কাজে লাগাইবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নাই, যদিও যে-অঞ্চল দিয়া ভল্‌গা প্রবাহিত হইয়া থাকে সেখানে জলস্রোতের সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করিতে পারিলে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত। ভল্‌গার অববাহিকাস্থিত কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টির অপ্রতুলতার জন্য কৃষিকার্যে ব্যাঘাত ঘটে, নদীর

জলসেচন সেখানে খুবই উপকারে লাগিতে পারে, কিন্তু নদী নিজে সেখানে কূলপ্লাবী নয়। তাই এই নদীকে নূতন করিয়া গড়িবার প্রচেষ্টা হইতেছে যাহাতে ইহার জলপ্রবাহকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান যায়। নদীর গভীরতা বাড়াইবার ব্যবস্থা ও জলস্রোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবার আয়োজন হইতেছে। বিজ্ঞানের সহায়তায় খামখেয়ালী নদী মানুষের স্ববশে আসিবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নদীসংস্কারের পশ্চাতে বিরাট অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকে। সমগ্র দেশ একটা নিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহদ্বারা বিধৌত হয় এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা, শুষ্কভূমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা, সহরে ও গ্রামাঞ্চলে পানীয়জল সরবরাহ এবং সর্বোপরি শিল্পবাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা হইয়া থাকে।

খাল খনন ভিন্নও নদীতে বাঁধ দিয়া নদীর জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা নদীসংস্কারকার্যের অন্যতম বিষয়। ইউক্রেন অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত নীপার নদী খরস্রোতের জন্য অনেকাংশে নৌবাহনের অযোগ্য ছিল। এই নদীর ভিতরে এক অতিকায় বাঁধ নির্মিত হওয়ার পর নদীর জলের উচ্চতা ১২৩ ফুট বর্ধিত হইয়াছে। ইহার ফলে ইউক্রেনের শস্যক্ষেত্রে প্রভূত জলসেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। নীপারের স্রোতবেগ মন্দীভূত হওয়ায় নদী নৌচলাচলের উপযোগী হইয়াছে এবং এক্ষণে কৃষ্ণসাগর হইতে নীপারের ঊর্ধ্বভাগ অঞ্চলে নৌচলাচল হইতেছে। নদীতে এইরূপ বাঁধ দিবার কার্যের বহুমুখী কল্যাণীশক্তি আছে। শুধু নীপারের জলস্রোত হইতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে তাহা জারের আমলে সমগ্র রাশিয়ায় যে বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপন্ন হইত তাহার চেয়ে অনেক বেশী।

সোভিয়েট রাশিয়ায় কৃষির প্রয়োজনে জলসেচনকার্যে যে পরিমাণ জলের চাহিদা হইতে পারে দেশের নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহদ্বারা সে প্রয়োজন মিটিতে পারে না। নদীর জলের অপচয় নিবারণ করিয়া একমাত্র বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাধীনে জলসরবরাহের ব্যবস্থা হইলেই তাহা সম্ভব। সেইজন্যই সোভিয়েট রাশিয়ায় দেশের সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে নদীসংস্কারকার্যও পুরোভাগে স্থান পাইয়াছে।

একথা সত্য যে নদীর শক্তির উপরেই ভিত্তি করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সকল প্রতিষ্ঠা। জারের আমলেও জলস্রোতে গ্রামের যাতাকলের চাকা ঘুরিত। এক্ষণে রূপটা বদলাইয়াছে, জলের স্রোতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিকশক্তি আজ সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পের প্রধান অবলম্বন।

বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় সাত সাগরের জলে আজ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে মস্কৌ শহর হইতে য়ুরোপীয় রাশিয়া অঞ্চলে অবস্থিত সকল সমুদ্রে গমনাগমন সম্ভব হইবে। সোভিয়েট রাশিয়ার মত শিল্পবাণিজ্যে প্রগতিশীল দেশের পক্ষে এই ব্যবস্থা অপরিহার্য।

যখন সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবে তখন বন্যা ও অনাবৃষ্টিকে রাশিয়ার কৃষক আর ভয় করিবে না, মরুভূমির ঊষর প্রান্তর শস্যশ্যামল হইয়া উঠিবে, সমুদ্রগামী জাহাজ ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তর্বাণিজ্যের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া পরিণত হইবে। এ স্বপ্ন নয়, কাহিনী নয়, অলীক কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য—বৈজ্ঞানিক সৃজনী প্রতিভার পরম প্রাপ্তি।

ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত

সমগ্র পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ লইয়া রাশিয়া দেশ গঠিত। এই বিস্তৃত ভূভাগের একাংশের সহিত অপরের যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের বিস্তৃতির তুলনায় পূর্বতন রাশিয়ায় খুবই স্বল্প ছিল। দেশের এক দিকে যখন খাদ্যাভাবে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইত অপরাংশে তখনই প্রচুর খাদ্যসম্ভার পচিয়া নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। রাষ্ট্রের এমন ব্যবস্থা ছিল না যাহাতে খাদ্যদ্রব্য দ্রুত এক স্থান হইতে অন্যত্র চালান করা সম্ভব ছিল। পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাসমরের সময় রাশিয়ার রণক্ষেত্রে সৈন্যেরা গোলাবারুদের অভাবে যখন অসহায় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে তখন হয়ত দেশের অন্য কোন প্রান্তে বা কারখানায় যুদ্ধোপকরণ প্রচুর মজুত ছিল। এমনই অব্যবস্থা দেশের হীন অবস্থাকে আরও দুর্গতির দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

জারের আমলের রাশিয়ায় যে-ভাবে রেলপথ নির্মিত ও বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতিরই পরিপূরক। রাশিয়ার দুইটি বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল, মস্কো ও লেনিনগ্রাড। রেলপথগুলি এমনই ভাবে ছড়ান ছিল যাহাতে দেশের আভ্যন্তরীণ কাঁচা মাল ঐ দুই কেন্দ্রে আনা চলিত। কিন্তু দেশের ভিতরকার প্রাকৃতিক সম্পদ পরস্পর বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। দেশের পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের অর্থাগমের সুবিধা করিবার জন্য এই কাঁচা মাল য়ুরোপের পশ্চিমভাগে চালান করার প্রয়োজন ছিল। রেলপথগুলি সম্ভবত এমনি পরিকল্পনা লইয়াই নির্মিত হইয়াছিল।

তাই রাশিয়ার পশ্চিমাংশেই যাহা কিছু রেলপথ ভিড় জমাইয়াছিল —অবশ্য ইহাও অন্যান্য দেশের তুলনায় মোটেই প্রচুর নহে। য়ুরোপীয় রাশিয়ায় প্রতি হাজার বর্গ কিলোমিটারে ১১·৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ ছিল, পক্ষান্তরে এশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়ায় ঐ পরিমাণ ভূভাগে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ০·৬ কিলোমিটার।

কিন্তু সোভিয়েট জাগরণের প্রাক্কালে এই সামান্য পরিমাণ রেলপথের অবস্থাও অতি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ৪৫০০টি রেলওয়ে সেতু বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই সেতুগুলি পর পর সাজাইয়া গেলে এইগুলির দৈর্ঘ্য হইবে ৬০ মাইল। সহস্র সহস্র মাইল রেলপথ অকর্মণ্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। এক লক্ষ মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ-সংযোগ-ব্যবস্থা অব্যবহার্য দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রেলওয়ে এঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী ও মালগাড়ীর অকর্মণ্য ধ্বংসস্তূপ বড় বড় স্টেশনপ্রান্তে ভিড় জমাইয়া ছিল। সাত আট বৎসর কোন প্রকার সংস্কার কার্য করা হয় নাই—উপরন্তু দেশের সর্বত্র অবাধে ধ্বংসলীলা চলে। তদুপরি জারের আমলে রাশিয়ায় সর্বসমেত যে ৪৩,৭৯৮ মাইল রেলপথ ছিল তন্মধ্যে ৭,০০০ মাইল রেলপথ যুদ্ধান্তে পোলাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার এলাকাভুক্ত হওয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার ভাগে ছিল মোটামুটি ৩৬,৩০০ মাইল। সোভিয়েট নবজাগরণের সূচনায় দেশের যানবাহন ব্যবস্থা এমনি ভগ্নাবস্থাপ্রাপ্ত, অপ্রতুল ও অকর্মণ্যই ছিল।

সোভিয়েট অগ্রগতির গোড়ার কথা শিল্পের প্রসার ও কৃষির উন্নতিবিধান। যে-কোন দেশের শিল্প বা কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সরবরাহ বা মাল চলাচল কার্যের প্রসার ও প্রয়োজন অপরিহার্য। শিল্পের জন্য যে কাঁচা মাল দরকার তাহা এক স্থান

হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে হইবে, শিল্পজাত দ্রব্য দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে হইবে। কৃষিপ্রধান অঞ্চল হইতে খাদ্যসম্ভার শিল্পকেন্দ্রে প্রেরণ না করিলে দেশের সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নহে। সুতরাং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কদিগকে যানবাহনাদির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইল।

অন্যান্য বিভাগের উন্নতির জন্য যে-প্রকার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি গৃহীত হইয়াছিল দেশের আভ্যন্তরীণ মালচলাচল ব্যবস্থার জন্যও সেইরূপ করা হইল। সোভিয়েট রাষ্ট্র সর্বপ্রথমে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য একদল সুনিপুণ কর্মী ও বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিল। রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য বহুসংখ্যক কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ওয়ার্কশপ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী পনর হাজার রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ার ও চৌত্রিশ হাজার মেকানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। এখন রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে একুশ হাজার ছাত্র শিক্ষা লাভ করে এবং উহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য দুই হাজার শিক্ষক আছেন। এতদ্ব্যতীত বহু সহস্র শিক্ষার্থী রেলওয়ে কলেজে শিক্ষা পায় ও হাতেকলমে কাজ শেখে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত লোকের হাতে ভারার্পণ করা হইয়াছিল বলিয়াই সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের মতই সোভিয়েট রেলওয়ে বিভাগও বিস্ময়কর অগ্রগতি ও কর্মপদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছে। রেলের কর্মিগণ প্রত্যেকেই বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং এই শিক্ষার ফলেই সামান্য একজন কর্মীও অনেক সময়ে মূল্যবান আবিষ্কার করিয়া থাকে।

অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার যানবাহনের উপর প্রচুর চাপ পড়ে। ১৯১৩ হইতে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে

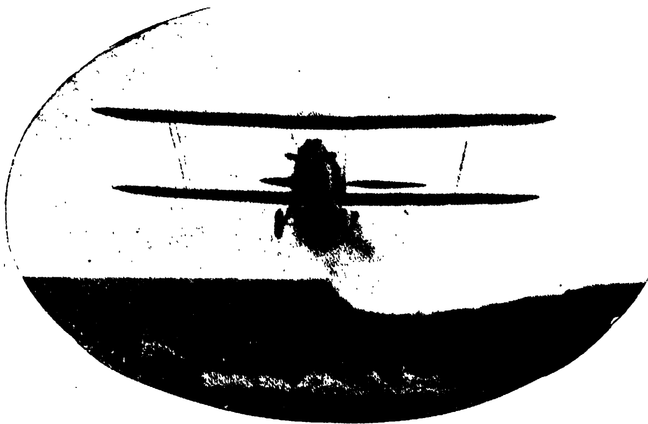
মালচলাচলের পরিমাণ আড়াই গুণ এবং যাত্রীসংখ্যা সাড়ে তিন গুণ বর্ধিত হয়। কিন্তু এই সময়ে রেল লাইনের দৈর্ঘ্য সমানুপাতে বর্ধিত হয় নাই—মোটামুটি দেড়গুণেরও কম রেললাইন বাড়িয়াছিল। ইহার কারণ কর্তৃপক্ষ রেললাইনের দৈর্ঘ্যের চেয়ে রেলবিভাগের সর্বাঙ্গীণ কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার দিকে বেশী যত্নবান হইয়াছিলেন। রাশিয়ায় রেলওয়ে স্থাপনের পথে নানাপ্রকার অভিনব সমস্যা আসিয়া দেখা দেয় যেগুলি অন্য দেশে তত প্রকট নহে। সোভিয়েট বিজ্ঞানকে এই সকল সমস্যার যথাযথ নিরাকরণ করিতে হইয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার অনেকাংশ মরুভূমি, বহু স্থান জঙ্গলাকীর্ণ, উত্তরাঞ্চল তুষারের দেশ, দেশের অভ্যন্তরে নানাস্থানে পাহাড় পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। নানা বিচিত্র ব্যবস্থায় দেশের এই সকল দুর্গমস্থানে রেলপথ প্রসারিত হইয়াছে।

মরুভূমি অঞ্চলে জলাভাব। সেই সকল স্থানে নূতন রকম রেলওয়ে এঞ্জিনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণত স্টীম-চালিত রেলওয়ে এঞ্জিনের বয়লারে জল স্টীমে পরিণত হয়। এই উচ্চ চাপের স্টীম এঞ্জিনের পিস্টনকে ঠেলিয়া দেয় এবং সম্প্রসারিত ও ঠাণ্ডা অবস্থায় নির্গমন পথে বাহিরে আসে। এক বার ব্যবহৃত স্টীম আর কোন কাজেই আসেনা। সেইজন্য এঞ্জিনকে কিছুদূর চলিবার পর জল লইতে হয়। মরুভূমির দেশে জল তত সহজলভ্য নহে। এতদ্দেশে ব্যবহারযোগ্য এক প্রকার এঞ্জিন নির্মিত হইয়াছে, ইহাতে একবার ব্যবহৃত স্টীমকে পুনরায় ঠাণ্ডা করিয়া জলে পরিণত করা হয় এবং এই জলকে পুনরায় স্টীম তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। ইহাদিগকে 'কণ্ডেন্সর টাইপ' এঞ্জিন বলা হয়। এই সকল এঞ্জিনে একবার যে জল লওয়া হয় তাহাকে দশ

পনর বার ব্যবহার করা সম্ভব। ইহার ফলে এই জাতীয় এঞ্জিনকে প্রকার ভেদে ছয় শত হইতে এক হাজার মাইলের মধ্যে জল লইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। জলশূন্য দেশে এই এঞ্জিন খুবই কাজে লাগিতেছে। ইহাদের আরও একটি বিশেষ সুবিধা আছে—ইহাতে জ্বালানীর খরচাও শতকরা পনর কুড়ি ভাগ কমিয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত স্টীমের পরিবর্তে তেলের চালিত ডিজেল-টাইপের রেলওয়ে এঞ্জিন ও মরুভূমি অঞ্চলে ব্যবহার করিবার জন্য নির্মিত বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা চালিত রেলওয়ে এঞ্জিনও সোভিয়েট রাশিয়ায় যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছে। লেনিনের প্রাথমিক উদ্যোগে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা এই প্রকার রেল-চালনায় সাহায্য করিয়াছে। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক রেল চালু হয়। তারপর উহা সহস্রাধিক মাইল প্রসারিত হইয়াছে। অনেক দেশে হাল্‌কা যাত্রী বহনের জন্য সহরতলী অঞ্চলে বৈদ্যুতিক ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। ইহারই অনুকল্প আমাদের দেশে ট্রাম গাড়ী রহিয়াছে। কিন্তু বিদ্যুতের সাহায্যে ভারী রেল চালাইবার জন্য রাশিয়াকে নূতন ধরণের শক্তিশালী বৈদ্যুতিক এঞ্জিন তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। এই সকল এঞ্জিনে তিন হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়। যাত্রীবাহী বৈদ্যুতিক এঞ্জিন ঘণ্টায় ৮৭ মাইল ও মালগাড়ীর এঞ্জিন ৫০ মাইল পর্যন্ত চলিতে সক্ষম। শহরতলী অঞ্চলের দুই শত মাইল হাল্‌কা রেলওয়ে ছাড়াও দূর-প্রসারী সহস্র মাইল বৈদ্যুতিক রেলের লাইন রহিয়াছে। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় বৈদ্যুতিক রেলের ব্যবস্থা মোটেই ছিল না। ট্রান্সককেশাস ও কোলা উপত্যকার পার্বত্য অঞ্চলে বৈদ্যুতিক রেল ব্যবস্থাই চলাচলের প্রধান উপায়।



পোকায় যাহাতে ফসল নষ্ট না করিতে পারে তজ্জন্য বিমান হইতে কীটনাশক ঔষধ ছিটাইয়া দেওয়া হইতেছে।



চিরতুষারাবৃত উত্তর মেরু অঞ্চলে বরফকাটা জাহাজের সাহায্যে পথ করা হইতেছে

জর্জি ব্যাবাট নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার বৈদ্যুতিক মোটর নির্মাণ করিয়াছেন যাহা চালাইতে ব্যাটারী, রেল বা ট্রাম গাড়ীর মত বৈদ্যুতিক তারের প্রয়োজন হয় না। মাটির নীচে প্রোথিত সংবাহক তারের ভিতর দিয়া স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলে—ইহারই ক্রিয়ার ফলে এই মোটর গাড়ী চালু হয়। এখনও এই প্রকার গাড়ী কার্যকরী অবস্থায় আসে নাই। তবে অদূর ভবিষ্যতে ইহার প্রচলন হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ কার্যকারিতা হিসাবে এই গাড়ী খুব সাদাসিধে।

একদা যে-দেশে যানবাহনের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল হরিণের গাড়ী অথবা উটের সারি সেই দেশে এখন অতি আধুনিক শক্তিশালী রেলওয়ে এঞ্জিন চলিতেছে। সোভিয়েট রেলপথের উন্নতির কথা বলিতে গেলেই রেলওয়েসমূহের পিপল্স্ কমিশার পদে অধিষ্ঠিত ক্যাগানোভিশের কথা আসিয়া পড়ে। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে সোভিয়েট রেলওয়ের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, নূতন ধরণের শক্তিশালী এঞ্জিন নির্মিত হইয়াছে যেগুলি ঘণ্টায় নব্বই হইতে একশত বার মাইল পর্যন্ত চলিতে সক্ষম।

শুধু এঞ্জিনের উন্নতি হইয়াছে তাহা নয়, গাড়ীগুলিরও অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। গাড়ীতে স্বয়ংক্রিয় ব্রেক, গাড়ী জুড়িবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, এইগুলি নবনির্মিত গাড়ীর অন্যতম বিশেষত্ব। একসঙ্গে বহু সংখ্যক গাড়ী নির্মাণ করিবার জন্য আগাগোড়া ধাতব পদার্থের তৈয়ারী এক রকম যাত্রীবাহী গাড়ী পরিকল্পিত হইয়াছে যাহাতে আধুনিক সকল রকম সুখসুবিধার ব্যবস্থা থাকিবে। যন্ত্রের সাহায্যে এইগুলি ব্যাপকভাবে নির্মিত হওয়া সম্ভব।

শিল্পবাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে রেলওয়েও এখন সমান-তালে অগ্রসর হইতেছে। ১৯২৭ হইতে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ এই পাঁচ

বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট য়ুনিয়নে ৩৪১২টি এঞ্জিন, ৪০৯২টি নূতন" প্যাসেঞ্জার গাড়ী ও ৬৬,৩৬১টি মালগাড়ী নির্মিত হইয়াছে। রেলপথ সম্প্রাসারণের ও দ্রুতগামী গাড়ীর প্রচলন হওয়ার ফলে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলের দূরত্ব কার্যত কমিয়া গিয়াছে। গোটা রাশিয়ার শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য যে-ভাবে এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে রেলপথের যোগাযোগের ফলেই তাহা অনেকাংশে সম্ভব হইয়াছে। এ কথা বলিলে এখন অবিশ্বাস্য মনে হইবে যে একদা লেনিন-গ্রাডে ব্যবহার করিবার জন্য কয়লা আনা হইত ইংলণ্ড হইতে, আইভানোভ অঞ্চলে যে কাপড়ের কল চলিত তাহার জন্য তুলা বিদেশ হইতে আসিত। এখন সোভিয়েট রাশিয়া কোন জিনিষেরই জন্য পরমুখাপেক্ষী নহে। রেলপথের বিস্তৃতি না হইলে ইহা সম্ভব হইত না।

একদা যে-সকল জিনিষের কোন মূল্য বা চাহিদা ছিল না, রেলওয়ের সম্প্রসারণের সঙ্গে সেইগুলি মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। গহন অরণ্যের ভিতরে সহস্র সহস্র পাইন গাছ—কী সেগুলির মূল্য—যদি না সেগুলিকে লোকালয়ে আনিবার ব্যবস্থা থাকে? তুর্কীস্থানের উর্বর ভূমির খুব কম অংশই তুলার চাষের জন্য ব্যবহৃত হইত, কারণ সেখানকার অধিবাসীদের তুলার প্রয়োজন ছিল না—ছিল খাদ্যশস্যের, তাই তুলার উপযোগী ভাল জমিতে তাহারা খাদ্যশস্যের চাষ করিতে বাধ্য হইত। অপর পক্ষে লেনিনগ্রাড ও মস্কৌতে ছিল তুলার অভাব। ব্যাপক রেলপথ প্রতিষ্ঠার পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্য বিনিময় সহজ হইয়াছে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে দেশজোড়া বণ্টনব্যবস্থা ও পরিকল্পনা করা সম্ভব হইয়াছে।

সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ার প্রদেশে প্রদেশে, জাতিতে জাতিতে যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই ফলে উনিশ কোটি লোক আজ এক রাষ্ট্রভুক্ত। অর্থনৈতিক অনন্যনির্ভরতা তাহার মূল কথা, এই অর্থনৈতিক যোগাযোগের সূত্র যোজনা করিয়াছে রেলপথগুলি।

রেলপথের পক্ষেও দুর্গম অঞ্চলে চলাচলের জন্য ব্যাপক মোটরের ব্যবস্থা আছে। পার্বত্য প্রদেশে ও বনভূমিতে মোটরের উপযোগিতা ও প্রয়োজন বেশী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ষোলহাজার ফুট ঊর্ধ্বে উঠিয়া পামীর পর্বতের ভিতর দিয়া ৪৫০ মাইল দীর্ঘ যে মোটরের রাস্তা গিয়াছে পৃথিবীতে অন্য কোথায়ও উহার চেয়ে বেশী উচ্চতায় কোন পথ অদ্যাপি নির্মিত হয় নাই। পনর বৎসর পূর্বে উটের পিঠে চড়িয়া এই পথ অতিক্রম করিতে কুড়ি পঁচিশ দিন লাগিত। পৃথিবীর ছাদ বলিয়া পরিচিত পামীরের মালভূমি চিরকালই মানুষের পক্ষে দুরধিগম্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; ইহার জন্য ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর বিচিত্র উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের উদ্যোগে এখানে রাস্তা তৈয়ারী হওয়ার পর বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন অনেক স্থানে নূতন সভ্যতার পত্তন হইয়াছে। এই পথেই মধ্য এশিয়ায় নবজাগরণের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, পাহাড় ডিঙাইয়া প্রাগৈতিহাসিক সর্দারতন্ত্রের দেশে গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জলপথের প্রসারের বিষয় অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। রাশিয়ার নদীগুলি দীর্ঘ এবং খরস্রোতা হইলেও সেগুলি শীতকালে জমিয়া

যায় এবং গ্রীষ্মকালে সেখানে জলাভাব ঘটে। কিন্তু তবুও মানুষের চেষ্টায় ঐগুলিকে নৌবাহনযোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। জলপথে অপেক্ষাকৃত কম খরচে অনেক ভারী মাল চলাচলের ব্যবস্থা সম্ভব। সেইজন্য বাণিজ্য বিষয়ক কার্যে জলপথ অধিকতর উপযোগী। একমাত্র ভল্‌গা নদী দ্বারাই ছয়টি রেলপথের কার্য চালান যাইতে পারে। বহুসংখ্যক খাল কাটিয়া নদীতে নদীতে যোগাযোগ স্থাপন করা হইতেছে। খরস্রোতা নদীতে বাঁধ দিয়া উহাকে নৌচলাচলের উপযোগী করা হইয়াছে। নদীতে বাঁধ দিবার ফলে নদীর জল ফাঁপিয়া উঠে এবং সেই জলোচ্ছ্বাসকে ব্যাপক অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের কার্যে প্রয়োগ করা সম্ভব। উপরন্তু জলোচ্ছ্বাসের জন্য নদী গ্রীষ্মকালেও নৌবাহনযোগ্য থাকে। বাঁধের জল কোন দ্বারপথে মুক্ত করিয়া দিয়া সেই স্রোতশক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন করা হইয়া থাকে।

উত্তর মহাসাগর দিয়া যাতায়াতের পথ আবিষ্কার সোভিয়েট য়ুনিয়নের অন্যতম কৃতিত্ব। ইতিপূর্বে পূর্বদিকে বেরিং প্রণালী ও পশ্চিমে নোভায়া জেমলিয়া—ইহার ভিতরে যে সুবিস্তৃত সৈকতরেখা রহিয়াছে সেখানে জলপথে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কুকুর কিম্বা হরিণটানা গাড়ী বরফের উপর দিয়া দেশের অভ্যন্তর হইতে সীমান্তে পৌঁছিতে পারিত। সোভিয়েট বিজ্ঞানের প্রসাদে বরফঢাকা সমুদ্রপথে এখন জাহাজ চলাচল সম্ভব হইয়াছে।

জনকল্যাণে এরোপ্লেনের ব্যাপক ব্যবহারে সম্ভবত রাশিয়ার সমকক্ষ আর কোন দেশ নাই। কৃষিকার্যে এরোপ্লেনের ব্যবহারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মধ্য এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের বাত্যাতাড়িত বালুকারাশি কৃষিভূমিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়া উহাকে কৃষির অযোগ্য করিয়া তোলে। এই প্রাকৃতিক উৎপাত দূরীকরণার্থ বালুকার উপরে এরোপ্লেনের সাহায্যে বীজ বপন করা হইয়া থাকে। এই বীজ হইতে যে গাছ জন্মে তাহারা বালুকাকে ধরিয়া রাখে।

বজ্রপাতে বনে দাবানলের সৃষ্টি হয়। জনবিরল টাইগা অঞ্চলে এমনি অগ্ন্যুৎপাত ফলে অনেক সময় বিস্তৃত ভূখণ্ডের ক্ষতি সাধিত হয়। এরোপ্লেনের সাহায্যে এই অগ্নি নির্বাপন করিবার নিয়মিত ব্যবস্থা আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তরভাগের বিস্তৃত ও দুর্গম বনভূমির কাষ্ঠসম্পদের বিষয় অবগত হইবার জন্য এরোপ্লেন হইতে ফোটোগ্রাফ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই উপায়ে অনেক নূতন অরণ্য অঞ্চল সম্বন্ধে সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এরোপ্লেনের সাহায্যে মাল ও যাত্রী চলাচলের ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এমন অনেক স্থান আছে যেখানে যাতায়াতের জন্য এরোপ্লেনই একমাত্র অবলম্বন। দ্রুতগামী ট্রেনে চড়িয়া যেস্থানে যাইতে দশ দিন লাগে সেখানে এরোপ্লেন হয়ত তিন দিনে পৌঁছায়। রাশিয়ার মত বিস্তৃত দেশে এই রকম সময় বাঁচানোর মূল্য খুব বেশী। দূরবর্তী সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চলের সঙ্গে দেশের মধ্যভাগের যোগাযোগের জন্য এরোপ্লেনের ব্যাপক ব্যবহার করা হইতেছে।

পামীরের পার্বত্য প্রদেশের গ্রামগুলি পাহাড়ের অলিগলির ভিতরে এমন ভাবে অবস্থিত যে সেখানে ঘোড়া বা খচ্চরই সম্ভবপর যানবাহন। এইসব জায়গায় এরোপ্লেনে যাতায়াতের ব্যবস্থা

আছে। পামীরের গগনচুম্বী শিখরদেশ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের গা ঘেষিয়া এই সব দেশে এরোপ্লেন যাতায়াত করিয়া থাকে।

সাইবিরিয়ার টাইগা অঞ্চল সর্বত্র জঙ্গলাকীর্ণ। নদীর জলপৃষ্ঠ ভিন্ন সেখানে এমন সমতল স্থান দেখা যায় না যেখানে এরোপ্লেন অবতরণ করিতে পারে। অন্যপ্রকার যানবাহন ত সেখানে সম্পূর্ণই অচল। এই সব স্থানে সী-প্লেন এক নদী হইতে উঠিয়া বনভূমির উপর দিয়া অপর নদীতে অবতরণ করে।

পূর্বসীমান্তের অনেকস্থানে এরোপ্লেনই ডাকচলাচলের একমাত্র ব্যবস্থা। উত্তর মহাসাগরের দেশে এরোপ্লেনের অন্যতম কার্য জাহাজকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া। বরফজমা সমুদ্রের ফাঁকে ফাঁকে কোথায় জলের রেখা রহিয়াছে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিয়া এরোপ্লেন জাহাজকে পথের সন্ধান দেয়।

আকাশচারী এরোপ্লেনের গতি সর্বদেশে বাধাহীন। বিবিধ প্রাকৃতিক সংস্থানের দেশ রাশিয়া। সকল প্রাকৃতিক বৈষম্যের সমন্বয় ঘটাইতে সেদেশে সেইজন্য এরোপ্লেনের কার্যকারিতা অনন্য-সদৃশ। কারাকুমের বালুকা চুম্বন করিয়া কিংবা উত্তর মহাসাগরের চিরতুষারের দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব ফেলিয়া সোভিয়েট বিমান মেরু ও মরুর মিলন ঘটাইয়াছে। টাইগার নীরব বনভূমির উপর কোলাহল তুলিয়া অথবা পামীরের হিমানী রেখার উর্ধ্বে উঠিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া সোভিয়েট এরোপ্লেন রাশিয়ার ভৌগোলিক অনৈক্যের মাঝে ঐক্যতানের সৃষ্টি করিতেছে।

পশু সম্পদ

গৃহস্থের সম্পত্তি ভূমি ও গোধন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রাকৃতিক খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্র গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বনের পশুর উন্নতিবিধানেও যত্নবান হয়। পূর্বে জারশাসিত রাশিয়ায় অন্যান্য দরিদ্র দেশের মতই গবাদি পশুর অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতেছিল। গতানুগতিকভাবে পশুপালন করিবার জন্যই গোধন ক্রমে ক্ষীয়মান হইয়া আসিতেছিল। সাধারণত একটি গরু গড়পড়তায় প্রত্যহ দুই সেরের বেশী দুধ দিত না। একটি মেষ হইতে বৎসরে যতটুকু পশম পাওয়া যাইত তাহার পরিমাণ ছিল তিন পাউণ্ডেরও কম। পশুপালন ব্যাপারে বিজ্ঞানের কিছু করিবার আছে বলিয়া কেহই মনে করিত না। সমগ্র রাশিয়ায় মাত্র ৭৪ জন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পশুবিশারদ ছিলেন। কৃষকের নিজের সারের প্রয়োজন ও আহার্যের যোগান দেওয়া ছাড়া গোমেষাদির কোন সার্থকতা ছিল না বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের এই বিষয়ে কোন কর্তব্যও ছিল না। সোভিয়েট জাগরণের প্রথমাবস্থায় রাশিয়ার গোধন চরম দৈন্যদশায় উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট শাসনাধীনে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে।

গবাদি পশুপালনে উন্নতির জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে ১৮টি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, ৭৮টি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান, প্রায় তিনশত শাখা প্রতিষ্ঠান এবং সম্মিলিত কৃষি প্রতিষ্ঠানের অধীন সহস্রাধিক লেবরেটরী আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসংলগ্ন পঞ্চাশটি গবেষণাগার আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ খুবই অল্প সময়ে পশুপালন বিষয়ক নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন কৃষিকার্যে নিয়োজিত শ্রমিকগণ পর্যন্ত নূতন ব্যবস্থার প্রয়োগ করিয়া গবাদি পশুর উন্নতি বিধান করিতেছে। ইহার ফলে এই দিক দিয়াও জাতীয় সম্পদ তথা জনগণের সুখসমৃদ্ধি বাড়িতেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এই সম্পদবৃদ্ধির স্বরূপ উপলব্ধি হইবে।

একটি গরু হইতে প্রতি বৎসর গড়ে একশত মণ দুধ পাওয়া যায়, এক একটি মেরিনো মেষ হইতে প্রতি বৎসর ১১ পাউণ্ড পশম সংগৃহীত হইয়া থাকে, একটি মুরগী বৎসরে গড়ে ১৬৫টি বা তাহার চেয়েও বেশী সংখ্যক ডিম দেয়, মৌমাছির একটি মাত্র চাক হইতে প্রায় তিন মণ মধু পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পশুপ্রজনন ব্যাপারেও অসামান্য সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। গোবৎসাদির অকালমৃত্যু বিলুপ্ত হইয়াছে। জাতিভেদে এক শত মেষ হইতে প্রতিবৎসরে গড়ে ১৩৫ হইতে ২৬৫টি পর্যন্ত মেষশাবকের জন্ম হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার পশু স্বীয় গুণবত্তায় পৃথিবীতে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। কারাভায়েভোর স্টেট ফার্মের গরু 'পোসলুশ্নিটসা' প্রতিবৎসরে ১৬ টন দুধ দিতে সমর্থ। রেসের ঘোড়া 'ঔলোভ' ২ মিনিট ৩·৪ সেকেণ্ডে ০·৯৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

পশুজীবনের এই রকম পরিবর্তনের মূল কথা মিশ্রপ্রজনন দ্বারা উহাদের বংশগতির উন্নতি বিধান। যে নীতির অনুসরণ করিয়া উদ্ভিদজীবনের পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে—সেই নিয়মেই পশুদের জীবনধারাতেও উন্নতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। কোনও বিশেষ

জাতের পশুর বিশিষ্ট গুণধারাকে অন্য পশুতে আরোপ করিবার কার্যে সোভিয়েট বিজ্ঞান অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। এবিষয়ে একাডেমী অফ সায়েন্সেসের সদস্য আইভানোভের কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন জাতের পশুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন গুণাবলীসম্পন্ন নূতন জাতের পশুর জন্মও সম্ভব হইয়াছে। আইভানোভ আসকানিয়া-র‍্যামবুইলেট নামে পরিচিত এক জাতীয় নূতন মেষের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের মধ্যে আমেরিকান মেষ ও রাশিয়ান র‍্যামবুইলেট মেষের গুণাবলী বিশেষরূপে বিদ্যমান—শুধু তাহাই নয়, এই জাতীয় মেষেরা অনেকাংশে আমেরিকান মেষ অপেক্ষা ভাল জাতের; ইহাদের ওজন বেশী হয়, ইহাদের দেহ হইতে পশম পাওয়া যায় বেশী পরিমাণে এবং ইহাদের শাবকেরা বংশানুক্রমিক গুণাবলী অধিকানুপাতে পাইয়া থাকে।

আইভানোভ ইংলণ্ডের সাদা জাতীয় শূকরের গুণাবলীর সঙ্গে একাধারে দক্ষিণ রাশিয়ার একজাতীয় শূকরের গুণাবলীসম্পন্ন এক নূতন ধরণের শূকরের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা কার্যত ইংলণ্ডের শূকরের চেয়েও ভাল জাতের এবং রাশিয়ার দক্ষিণ ইউক্রেনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

এই প্রকার মিশ্র প্রজননকার্য ব্যাপক সাফল্য লাভ করিয়াছে। ফিলিয়ানস্কী নামক একজন পশু-বিশেষজ্ঞ ককেশীয়-র‍্যামবুইলেট নামে পরিচিত এক নূতন জাতের মেষ সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজাকস্থানের বিশেষজ্ঞেরা আরও একজাতের মেষের উৎপত্তি সম্ভব করিয়াছেন যাহাদের পশম মেরিনো জাতের মেষের সমশ্রেণীর অথচ ইহাদের পশ্চাৎদেশে চর্বিভরা মাংসপিণ্ড জন্মে এবং সেজন্য উহারা মরুভূমির আবহাওয়ার পক্ষে বেশী উপযোগী।

বিভিন্ন প্রকার মিশ্র মিলন এবং এতদ্বিষয়ক গবেষণাকে কার্যকরী করিবার জন্য সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম গর্ভাধান (artificial fertilisation) প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে বাস্তবরূপ প্রদান করিয়াছেন। গোমহিষ, মেষ, শূকর, ঘোড়া, হাঁসমুরগী, মৌমাছি, প্রভৃতি প্রাণীতে এই প্রক্রিয়া সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই ব্যবস্থা সম্ভব হওয়ায় ইচ্ছামত যে-কোন জাতের পশুর পুং-জনন-বীজ দ্বারা অন্য জাতের স্ত্রীপশুর গর্ভাধান করা হইতেছে এবং ইহার ফলে নানা প্রকার অদ্ভুত গবেষণা ও পরিকল্পনা সফলতা লাভ করিতেছে। নানা রকম যন্ত্রাদির সাহায্যে খুবই সহজ প্রক্রিয়া দ্বারা সামান্য কৃষক পর্যন্ত এই কাজ করিতে সক্ষম। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েট য়ুনিয়নের অধীনে পাঁচ কোটি গবাদি পশুর কৃত্রিম গর্ভাধান করান হইয়াছিল। এই কৃত্রিম গর্ভাধানের ফলে একদিকে যেমন নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্ভব হইয়াছে এবং যাহার ফলে নূতন উন্নত পশু জন্মগ্রহণ করিতেছে তেমনি আবার একটি ভাল জাতের পশুদ্বারা একই সঙ্গে বহুসংখ্যক স্ত্রীপশুর গর্ভাধান করান সম্ভব হইতেছে। একটি ষাঁড় এইভাবে প্রতিবসর ১৫০০ গাভীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছে, একটি মেষ এক বৎসরে ১৫০০০ শাবকের জনক হইবার সম্মান পাইতেছে, স্বাভাবিক উপায়ে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। এক দেশের বা অঞ্চলের পশুর সঙ্গে অন্যস্থানের পশুর যৌন মিলন পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে—যদিও একের সঙ্গে অপরের দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে না।

কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থাদ্বারা ক্রমশ গবাদি পশুর বংশগত উন্নতি হইতেছে। হীনবীর্য, দুর্বল, অলস ও অপুষ্ট পশু রাশিয়ায় নাই বলিলেই চলে।

আসকানিয়া-নোভার জীববিদ্যাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানে গৃহপালিত পশুর সঙ্গে সমজাতীয় বন্য পশুর মিশ্রমিলনদ্বারা নূতন পশুর সৃষ্টি করিবার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা আছে। এইরূপ মিশ্রমিলনে পশুদের বংশগতি উন্নত হয়। ষাঁড় ও বাইসন, অশ্ব ও জেব্রা প্রভৃতির মিলনে নূতন পশুর সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী হইতে বহু পূর্বে লোপ পাইয়াছে সেই রকম পশু (যেমন বুনো গরু) জন্মান হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠানে বন্য জন্তুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করিবারও চেষ্টা করা হয় এবং ইহার ফলে কৃষিকার্যের উপযোগী অনেক নূতন পশু পাওয়া গিয়াছে।

ডারউইনের মতবাদানুযায়ী পরিপার্শ্বের প্রভাবে প্রাণীর প্রকৃতি গঠিত হয় বা বদলায়। এই মতবাদকে কার্যত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ ও এই সত্যের ব্যবহার করিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অনেক বিস্ময়কর ফল পাইয়াছেন। পশুদের আহার্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাও পরিপার্শ্বের অন্তর্ভুক্ত এবং সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই দিক দিয়া নানারূপ পরিবর্তনদ্বারা পশুদের আংশিক রূপান্তর সম্ভব করিয়াছেন। একাডেমী অফ সায়েন্সেসের লিস্কুন নামক জনৈক সভ্য প্রমাণ করিয়াছেন যে খিরগীজ ও কালমিকের গরুর জন্য যথোপযুক্ত আহার্য ও চারণ ব্যবস্থা করিলে উহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং উহারা ক্ষুদ্র শৃঙ্গবিশিষ্ট অপর এক জাতীয় গরুর সমপর্যায় লাভ করে। এই প্রক্রিয়ায় ২½ বৎসরের মধ্যে গো-বৎস যে-প্রকার পুষ্টি লাভ করে তাহা অনন্যসাধারণ ও খুব ভাল জাতের গরুতেই সম্ভব অর্থাৎ যে গুণাবলী বংশজাত বলিয়া জানা আছে তাহা অন্য উপায়েও প্রদান করা যায়। বহুসংখ্যক পশুপালন প্রতিষ্ঠানে এক্ষণে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

মানুষের খাদ্যের উপাদান নিয়ন্ত্রণ করিয়া যেভাবে তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি ও রোগপ্রবণতা নিবারণ করা সম্ভব—পশুদের বেলাতেও সোভিয়েট রাশিয়ায় অনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়া থাকে। অধ্যাপক সোলান দেখাইয়াছেন যে গর্ভবতী পশুর পক্ষে ভিটামিন 'এ' সম্বলিত খাদ্য অত্যাবশ্যক। ঘোটকীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে গর্ভাবস্থায় খাদ্যে ভিটামিন-'এ' বিদ্যমান থাকিলে শাবক বলশালী হইয়া থাকে। খাদ্যের উপাদানের জৈবিক ক্রিয়া বিষয়ক গবেষণা দ্বারা পশুকে যথাযথ খাদ্য প্রদান করা এবং এতদ্বারা পশুর উন্নতি সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া খনিজপদার্থঘটিত খাদ্যের প্রভাব বিষয়েও গবেষণা করা হইতেছে। এই সকল তথ্য জানিবার ফলে খাদ্য ও পালন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণদ্বারা পশুর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি তথা দেশের পশুসম্পদকে দ্রুত বাড়ান সম্ভব হইয়াছে।

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পশুসম্পদ বৃদ্ধি করিবার ফলে ১৯৩৩-৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার গরুর সংখ্যা ৬৪·৬% বর্ধিত হয়, ঐ কালে ছাগমেষ বাড়ে ১০৪·২% এবং শূকরের বৃদ্ধি হয় ১৫২·৯%। ঐ সময়ে জার্মানীতে এই জাতীয় পশুর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। তখন সমগ্র জার্মানীতে যতগুলি মেষ ছিল সোভিয়েট রাশিয়ায় এক বৎসরে (১৯৩৭) তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক মেষ জন্মে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই গৃহপালিত পশুর সংখ্যা এই হারে বাড়ান সম্ভব হয় নাই। বিজ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন এই প্রকার বৃদ্ধি কদাপি সম্ভব ছিল না।

কৃত্রিম উপায়ে ঘাস জন্মাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় মেরু অঞ্চলে গবদি পশুপালন সম্ভব হইয়াছে। মরুপ্রদেশে চাষাবাদের ফলে সেখানেও মেষপালন করা আজ আর অসম্ভব নহে।

শুধু গৃহপালিত পশুর উন্নতিই সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই বিষয়ে একমাত্র লক্ষ্য নয়। যে-সকল বন্য পশু মানুষের কাজে লাগে বা আর্থিক উন্নতির কারণ হয় তাহাদের বিষয়েও সোভিয়েট রাষ্ট্রে নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। পুরাকালে যাহারা রাশিয়ায় বসবাস করিয়া গিয়াছে তাহারা প্রাকৃতিক প্রাণ-সম্পদ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেয় নাই; তাহারা বন্য শিকারী পশুর মত নিজেরও নিরীহ পশুদের বংশনাশনকেই চিরন্তন প্রশ্রয় দিয়া আসে এবং সেই জন্যই তাহাদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের ফলে অনেক বন্য পশু লোপ পায়।

য়ুরোপের লাল হরিণ আর দেখা যায় না। বন্য শূকর সব নিঃশেষ হইয়াছে। মস্কৌ অঞ্চলে যে-সকল বন্য ছাগল দেখা যাইত তাহাদেরও নির্মূল করা হয়। 'বন্য-হরিণ' সেও বড় একটা দেখা যায় না। সাইবেরিয়ার টাইগা অঞ্চলে বহু লোমশ প্রাণী ছিল এবং ঐ অঞ্চল পশুর পশম বা 'ফারের' জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রাশিয়া কর্তৃক সেই দেশ অধিকৃত হইলে সেই সব প্রাণীর সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে। অর্থলোভে শিকারীরা চামড়ার জন্য ঐ সকল পশুকে নির্মমভাবে হত্যা করিত যাহার ফলে কোন কোন অঞ্চল হইতে উহারা লুপ্ত হইল।

এক্ষণে সোভিয়েট রাশিয়ায় পশুশিকার কার্যেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়। নানা প্রকার বিধিনিষেধ ও সংরক্ষণ-প্রণালীদ্বারা অবাধ প্রাণীহত্যা নিবারিত হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় পশুর সংখ্যা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। নেকড়ে শিকার বারমাসই চলিতে পারে, কিন্তু কাঠবিড়ালী শিকারের নির্দিষ্ট সময় আছে। ঈগ্রেট ও হরিণ শিকার একেবারে নিষিদ্ধ। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায়

যে-সকল পশুপক্ষী লোপ পাইতে বসিয়াছিল তাহাদেরও পুনরায় বংশবৃদ্ধি হইতেছে।

শিকার বিষয়ক শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে পশুপক্ষীর রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করা হইয়া থাকে। ইহারই ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার পশুপক্ষীকে কাজে লাগাইবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। বন্য পশুকে আবদ্ধ অবস্থায় সন্তানোৎপাদনে অভ্যস্ত করান হয়। 'ফার' বা লোমের জন্য অনেক পশুকে এইরূপ রাখা হইতেছে। 'পিপল্‌স্ কমিশারিয়েট ফর ফরেন ট্রেড' এর অধীন কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে ২১০০০ লোমশ প্রাণী প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা আছে। রুপালী শৃগাল, মার্টেন, রেকুন, মেরুশৃগাল মিন্‌ক, মেরুবিড়াল, সেবল প্রভৃতি প্রাণীকে ব্যাপকভাবে মানুষের অধীনে রাখিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে নিয়োজিত করা হইতেছে।

রাশিয়ায় পশুপক্ষী স্বভাবত যে-ভাবে দেশময় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা ঠিক প্রাকৃতিক খাদ্যসংস্থানের সহিত সংগতি রাখে নাই। দুর্গম গিরিবন, বেগবতীনদী কিংবা দুস্তর মরুপথের জন্য পশুরা এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রব্রজন করিতে পারে না—অথচ করিতে পারিলে উহাদের অধিকতর খাদ্যের সংস্থান হইত। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে প্রচুর খাদ্য সম্পদ থাকিলেও সেই অঞ্চলে সেই খাদ্যকে কাজে লাগাইবার মত প্রাণী নাই। স্তেপভূমির ব্যবধান কাঠবিড়ালীকে ককেশাস অঞ্চলে অভিযান করিতে দেয় না, যদিও ককেশাসের জঙ্গলে কাঠবিড়ালীর উপযুক্ত খাদ্যসম্ভারের প্রাচুর্য রহিয়াছে। সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ স্তেপভূমিতে খরগোস দেখিতে পাওয়া যায় না--অথচ সেখানে খাদ্যের অভাব নাই। পশ্চিমাঞ্চল হইতে খরগোস পূর্ব দিকে আসিতে পারে না, কারণ মধ্যে রহিয়াছে য়ুরোপের পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ

স্থান। মাটিতে শীতকালে যে বরফ জমে তাহার উপর দিয়া খরগোসের যাওয়া সম্ভব নহে—পায়ের নখ বরফে আটকাইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে অবশ্য খরগোস ইচ্ছা করিলে পূর্ব দিকে যাইতে পারে, কিন্তু তখন উহাদের প্রজনন ঋতু—উহারা তখন সন্তানপালনে ব্যস্ত।

সোভিয়েট রাষ্ট্র পশু-অধ্যুষিত স্থানের প্রাকৃতিক বণ্টন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে। প্রকৃতির ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয়—সোভিয়েট বিজ্ঞানিগণ এই মতবাদে আস্থাবান নহেন। মানুষ ইচ্ছা করিলে প্রকৃতির ত্রুটিকে সংশোধন করিতে পারে। য়ুরোপীয় রাশিয়া হইতে খরগোসকে সাইবেরিয়াতে পাঠান হইয়াছে। কামচাটকা হইতে সামুদ্রিক ওটার কোলা উপসাগরে চালান করা হইয়াছে। সামুদ্রিক ওটারের চামড়া খুব দামী জিনিষ। এইরূপ কালো সেবলের চামড়াও খুবই মূল্যবান। কালো সেবল খুবই কম জায়গায় পাওয়া যায়। ইহাদিগকে সাইবেরিয়া হইতে ইউরাল অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে; আবার ইউরাল হইতে মিন্‌ক গিয়াছে সাইবেরিয়ায়, ককেশাস হইতে শ্যাময় গিয়াছে মধ্য এশিয়ায়। এই সকল নূতন বণ্টনব্যবস্থা সবই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ককেশাসের কাঠবিড়ালীকে উত্তরাঞ্চলে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু এই পরিকল্পনায় একটা বিপদও আছে। কাঠবিড়ালীর শত্রু মার্টেন ঐ অঞ্চলের প্রাণী। তাই ককেশাসের কাঠবিড়ালীর সঙ্গে সঙ্গে সাইবেরিয়ার লেগোমীসকেও উত্তরাঞ্চলে পাঠান হইবে যাহাতে মার্টেন লেগোমীসের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া কাঠবিড়ালীকে রেহাই দিতে পারে।

অনুকূল পরিপার্শ্বে পশুপক্ষীকে স্থানান্তরিত করা ভিন্নও বিশেষ বিশেষ প্রাণীকে প্রতিকূল পরিবেশে অভ্যস্ত করিবার বৈজ্ঞানিক

ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। যে সত্যকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন আবহাওয়ার উদ্ভিদকে সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রয়োজনানুযায়ী অঞ্চলে জন্মান সম্ভব হইয়াছে, সেইরূপ চেষ্টাদ্বারাই সোভিয়েট রাশিয়ায় মানুষের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার প্রাণীর উপনিবেশ গঠিত হইয়াছে।

এরোপ্লেনে করিয়া কৃষ্ণসাগরের কয়েক জাতীয় মৎস্যকে কাস্পিয়ান সাগরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। লেনিনগ্রাড অঞ্চলের শ্বেতমৎস্যকে শৈশব অবস্থায় আরমেনিয়ায় লইয়া গিয়া সেভানের পার্বত্য হ্রদে বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে। পূর্বসীমান্তের ফুটকিওয়ালা হরিণকে রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত ইউক্রেনের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শুধু রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের পশ্বাদি স্থানান্তরকরণই এতদ্বিষয়ে সবটুকু নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেক প্রয়োজনীয় প্রাণী এখন রাশিয়ার অধিবাসী হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার কস্তুরী মুষিক মূল্যবান চামড়ার জন্য বিখ্যাত। ইহাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়—অর্থনৈতিক দিক দিয়া এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে রাশিয়ার বনেজঙ্গলে থাকিতে অভ্যস্ত করা হইয়াছে এবং অল্পকাল-মধ্যেই ইহাদের সংখ্যা দ্রুত বর্ধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উত্তর আমেরিকার স্কাঙ্ক, মিন্‌ক, রুপালী শেয়াল প্রভৃতি প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। ইহা ছাড়া কস্তুরী-ষাঁড়, উত্তর আমেরিকার রেকুন, হিমালয়ের পাণ্ডু, অষ্ট্রেলিয়ার অপোসাম প্রভৃতি প্রাণীকেও রাশিয়ার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। খনিজ ও উদ্ভিদ সম্পদের মতই সোভিয়েট রাশিয়া পশুসম্পদে অনন্যনির্ভর হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।



উজবেকিস্থানের মেয়েরা উদ্ভিদবিদ্যা চর্চা করিতেছে। এককালে এখানকার লোক ছিল অশিক্ষিত যাযাবর।

লেনিনের উদ্যোগে সোভিয়েট রাশিয়ায় বনের পশুর প্রতি যথোচিত যত্ন লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের অরণ্য প্রদেশে স্বভাবজ প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য সংরক্ষিত স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই সকল বনাঞ্চলে স্থানীয় উদ্ভিদও যথেচ্ছ জন্মিতেছে এবং পশুপক্ষীরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে।

ইউক্রেনের দক্ষিণে স্তেপভূমিতে আসকানিয়া-নোভার সংরক্ষিত স্থানে উদ্ভিদ-উদ্যান, পুষ্করিণী, কৃষিক্ষেত্র, পশুচারণক্ষেত্র রহিয়াছে। সেখানে বাইসন, জেব্রা, উটপাখী, ফ্লেমিংগো প্রভৃতি পশু ও পক্ষীকুল বাস করে। ককেশাসের পর্বতের সংরক্ষিত স্থানে বন্য ছাগ, হরিণ, শ্যাময়, ভল্লুক, নেকড়ে, সবুজ কাঠঠোকরা প্রভৃতি পশুপক্ষী বাস করিয়া থাকে। সাইবেরিয়ার আল্‌টাই পর্বতের তুষারমণ্ডিত উচ্চ প্রদেশে তদ্দেশীয় হরিণ, সেবল, চিতাবাঘ, লিংকস, ভল্লুক প্রভৃতি পশুর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট আছে। আষ্ট্রাখানের সংরক্ষিত এলাকা ভল্‌গা নদীর বদ্বীপে অবস্থিত—সেখানে নানাজাতীয় জলচর পাখী ও মৎস্যাদির থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

কামচাটকায় যে সংরক্ষিত স্থান আছে সেখানে অনেক প্রকার লোমশ প্রাণী প্রাকৃতিক পরিবেশে অথচ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার ভিতরে বসবাস করিয়া থাকে। উত্তর ইউরালে এক সংরক্ষিত স্থানে সেবল, কাইডার, অটার, মার্টেন প্রভৃতি বাইশ রকম প্রাণীর আবাসভূমি। এই প্রাণীগুলি ব্যবসায়ের দিক দিয়া খুবই প্রয়োজনীয়।

এই সকল সংরক্ষিত স্থানগুলি কেবল পশুপক্ষীর স্বাভাবিক আবাসস্থল মাত্রই নহে; এখানে নানাজাতির জীবতত্ত্ব বিষয়ক পরীক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থাও আছে। এইগুলি প্রাকৃতিক

প্রাণসম্পদের উদ্ধার ও সংরক্ষণের কেন্দ্র। লুপ্তপ্রায় পশুপক্ষী ও বিরল প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। ককেশাসের সংরক্ষণস্থানে বুনো গরু দলবদ্ধ হইয়া বাস করে—পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এই প্রাণী নাই। বন্য বলগা হরিণের বংশ প্রায় লোপ পাইতেছিল—এক্ষণে ল্যাপল্যাণ্ডের সংরক্ষণস্থানে ইহাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হইতেছে।

বনের পশু বনে থাকে, মানুষের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ! মানুষ সখের বশে শিকার করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে—মানুষের সেই আত্মপ্রসাদলাভই কি বনের পশুর সার্থকতা! বনের পশুকে প্রয়োজনে লাগাইয়া লাভবান হইবার চেষ্টায় অগ্রণী হইয়াছে সোভিয়েট রাশিয়া। বিজ্ঞান এই পথে তাহার প্রধান সহায়। পশুর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংরক্ষণ ও সংখ্যাবৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ করিতে হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার বনভূমি তাই আজ ব্যসনকামী মানুষের অবসর বিনোদনের কিম্বা দুঃসাহসী মানবের বীরত্ব-প্রদর্শনের স্থান মাত্র নহে। এক একটি বনভূমি জাতির অর্থনৈতিক বিবর্ধনে নিয়োজিত গবেষণাক্ষেত্র—কোথায়ও বা বিজ্ঞানী প্রকৃতির সাহচর্য করিতেছে, কোথায়ও আবার প্রকৃতির রূপ ও রীতি বদলাইয়া মানুষ করিতেছে নবতম সৃষ্টি।

মৃতজনে দেহ প্রাণ

মানুষের মৌলিক অধিকারের তালিকা লইয়া বিভিন্ন দেশের মনীষীদের মধ্যে অনেক মতানৈক্য হইয়া থাকিলেও একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে অভাব, অশিক্ষা ও ব্যাধি এই তিনটিই মানুষের দুঃখদুর্দশার মূল কারণ। মানুষকে বাঁচার মতন করিয়া বাঁচিতে হইলে তাহার জন্য প্রয়োজন অর্থ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। সুতরাং কোন অধঃপতিত জাতির উন্নতিকল্পে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাই সবটুকু নহে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে অপর সকল সমস্যা জড়িত রহিয়াছে; তথাপি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাই মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের সবটুকু নহে। আর্থিক প্রাচুর্য থাকিলেই মানুষ জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে একথা সর্বাংশে সত্য নয়। বার্ধক্যের অভিশাপ, ব্যাধির ভোগ ও মৃত্যুর বিভীষিকাকে অর্থের চাপে দূরে ঠেকাইয়া রাখা সর্বদা সম্ভব নহে।

জরাব্যাধি প্রপীড়িত জীবের দুর্দশা সন্দর্শনে ব্যথিত এক রাজার দুলাল একদা অতুল রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভগবান তথাগতের ত্যাগ ও তপস্যার বিনিময়ে বিশ্ববাসী যে জ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছিল তাহাতে জীবের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকিলেও ব্যাধি ও বার্ধক্যের প্রকোপ হইতে মুক্তি পাইয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু বারংবারের ব্যর্থতা মানুষকে সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করে নাই। প্রকৃতিকে সর্বভাবে বশ করিয়া লওয়াই বিজ্ঞানের চেষ্টা, তাই

রোগভোগের দায় হইতে মানুষের মুক্তি দেওয়াও বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য হইয়াছে।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতির ব্যাপক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সোভিয়েট বিজ্ঞানিগণ কর্মতৎপর। অন্য সকল বিভাগের মতই এই দিক দিয়াও সোভিয়েট রাশিয়ার কার্যধারার বৈশিষ্ট্য আছে। রোগের হাত হইতে মুক্তির উপায় সন্ধান করিতে রাষ্ট্রের অধীনে বৈজ্ঞানিক কর্মিগণ সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন পৃথিবীর অন্যত্র অনুরূপ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। সেইজন্য আয়ুর্বিজ্ঞানে সোভিয়েট সিদ্ধির স্বরূপ অনন্য-সদৃশ। জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য স্বল্প পরিশ্রম, যথাপ্রয়োজন বিশ্রাম, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর আহার্য প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং রোগীর জন্য হাসপাতাল, স্যানিটোরিয়াম নির্মাণ প্রভৃতি মামুলি ব্যবস্থার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক কর্মিগণ চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে এমন কতকগুলি বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করিয়াছেন বা এতদ্বিষয়ে সচেষ্ট আছেন যাহার ফলে ভবিষ্যতে যে শুধু চিকিৎসাপদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আমূল পরিবর্তিত হইবে তাহাই নয়, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য মানুষ নূতন অস্ত্রের সন্ধান পাইবে। অতীতে সন্ন্যাসীর তপস্যায় যাহা মানুষের কাছে সহজলভ্য হয় নাই, বিজ্ঞানী তাপসের সাধনায় সেই জরাব্যাধির বিভীষিকা হয়ত বা খানিকটা বিদূরিত হইবে।

অধুনা 'ব্লাড ব্যাঙ্ক' বা রক্ত সরবরাহদ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলনের প্রাথমিক গৌরব রাশিয়ার প্রাপ্য। যদিও একের দেহ হইতে সোজাসুজি রক্ত অন্যের দেহে

চালনা করিয়া রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস আধুনিক নহে, কিন্তু রক্তকে বোতলে ভরিয়া রাখিয়া পরবর্তীকালে ইচ্ছামত ব্যবহার লাগাইবার উপায় আবিষ্কার করিবার কৃতিত্ব সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাশিয়াতেই ব্লাড-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে মস্কোতে রক্ত-সরবরাহ চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল না। তৎপরে লেনিনগ্রাড, খারকোভ, ওডেশা, কিয়েভ, তাশখেন্দ প্রভৃতি স্থানে ঐ প্রকার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এক্ষণে রাশিয়ায় হাজারখানেক রক্তসরবরাহ-কেন্দ্র আছে এবং এই সব কেন্দ্র হইতে দেশের যে-কোন অঞ্চলে রক্ত পাঠাইয়া চিকিৎসা করিবার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কোন স্থানে হয়ত দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তির শরীরে আঘাত লাগিয়া প্রচুর রক্তপাতের দরুণ প্রাণসংশয় হইয়াছে। রেডিয়োর মারফতে খবর পাঠাইবার ফলে স্বল্পকাল মধ্যে বোতলে-ভরা রক্ত লইয়া এরোপ্লেন আসিয়া হাজির হইল এবং প্যারাস্যুটের সাহায্যে রক্তের বোতল নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাইল একজন সামান্য মানুষ। চিকিৎসার এইরূপ সুব্যবস্থা রাশিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় মহাসমরে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপক রক্ত-সরবরাহের ব্যবস্থা থাকায় রাশিয়ায় আহত সৈনিকের মৃত্যুর হার অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম ছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সুবন্দোবস্ত এতদ্বিষয়ে অনেকাংশে দায়ী হইলেও সহস্র সহস্র রাশিয়ান নাগরিকের রক্তদান ব্যাপারে আগ্রহ এবং উৎসাহের কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বটে। তানিয়া বারোভা নাম্নী জনৈকা মহিলার জীবন

একদা রক্তসরবরাহ দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল। এক্ষণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি সর্বদাই রক্তদান করিতে প্রস্তুত। প্রতি ছয় সপ্তাহ পর তিনি একবার করিয়া রক্তদান করেন।

ক্রাশিনস্কী নামক রাশিয়ার এক ভদ্রলোক গত বার বৎসরে একশত তিন বার রক্ত দিয়াছেন। এই প্রকার রক্তদাতাদের যাহাতে স্বাস্থ্যহানি না ঘটে সেজন্য আহার ও পুষ্টির উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

দেহমধ্যে রক্তসরবরাহ করিবার নব নব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। রক্ত হইতে প্লাসমা পৃথক করিয়া লইয়া উহাকে শুষ্ক অথবা জমাট আকারে দূরে পাঠাইবার ব্যবস্থাতে নূতনত্ব রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রক্তের পরিবর্তে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈয়ারী কৃত্রিম রক্তদ্বারা চিকিৎসাব্যবস্থা সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম আবিষ্কার।

চিকিৎসা বিষয়ে রাশিয়ার অগ্রগতির বিষয় বলিতে হইলে সর্বাগ্রে অস্ত্রচিকিৎসার কথা উল্লেখ করিতে হয়।

জীবের দেহের গঠনের গোড়ার কথা ভাবিলে দেখা যায় অসংখ্য কোষে গঠিত জীবদেহ, ইহাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সজীবতা রহিয়াছে। ইহাদের বহুর সমাবেশে এক একটি অঙ্গ। অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমবেত সংঘে একটি জীবদেহ—সে যেন এক যৌথ পরিবার। প্রত্যেকটি অঙ্গকে সজীব ও সক্রিয় রাখিতে একে অপরকে সাহায্য করিতেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন জীর্ণ হয়, জরার শৈবালদলে তখনই প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং তাহা হইতেই আসে দেহের মৃত্যু। মানুষের কোন অঙ্গ বিকল হইয়া গেলে তাহার প্রতিকার মানুষের আয়ত্তের বাহিরেই ছিল

বলা চলে। হাতের একটি অঙ্গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে হাতখানা চিরকালই রহিয়া গেল কলঙ্কী।

জড়যন্ত্রে যে-প্রকার আংশিক পরিবর্তন সম্ভব, মানুষের দেহযন্ত্রের অনুরূপ সংস্কার এতকাল অসম্ভব বলিয়াই মনে করা হইত। ইচ্ছা করিলেই মানুষের একখানা বিকল হাতের পরিবর্তে অপরের একখানা ভাল হাত লাগাইয়া দেওয়া যায় না। যক্ষ্মারোগীর রোগগ্রস্ত ফুসফুসের পরিবর্তে নূতন ফুসফুস কিংবা ক্যানসারদুষ্ট জরায়ুর পরিবর্তে নূতন জরায়ু সংযোজন, সে ত অবাস্তব স্বপ্নই।

কিন্তু নিম্নস্তরের অনেক প্রাণীর ও উদ্ভিদের অল্পাধিক পরিমাণে এই প্রকার শক্তি আছে। ক্রমবিবর্তনের ধারা বাহিয়া মানুষের দেহযন্ত্র যে জটিলতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছে তাহারই বেড়াজালে দেহের সহজ পরিবর্তন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; নতুবা অঙ্গসংস্কার গাছের নিয়মিত কার্য, গাছের নিত্য নূতন পাতা গজায়, একটি শাখা কাটিয়া ফেলিলে অপর শাখা তাহার স্থলবর্তীরূপে দেখা দেয়। টিক্‌টিকির কাটা লেজ বাড়ে, পাখীরা পালক বদলায়। এই স্বভাবের রেশটুকু মানুষেরও রহিয়াছে—মানুষের চুল ও নখ কাটিলে এখনও বাড়ে, কিন্তু অঙ্গসংস্কারে মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ঐ পর্যন্ত।

কিন্তু মানুষ স্বভাবকে অতিক্রম করিতেছে। আংশিক ভাবে দেহের সংস্কারকার্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে। একের রক্তে অপরের প্রাণপুষ্টির ব্যবস্থা সে ত এই ব্যাপারই। অকর্মণ্য গ্লাণ্ড অপসরণান্তর অন্য জীবের গ্ল্যাণ্ডদ্বারা দেহকে নূতন জীবন দানের পরিকল্পনা এখন বাস্তব রূপ পাইয়াছে। এই প্রকার দেহের ছোট-খাট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অংশ বা উপাদান বদলাইয়া দেহের সংস্কার সম্ভব

দেখিয়া এই বিষয়ে মানুষের প্রচেষ্টা ক্রমে উৎসাহপ্রাপ্ত ও অগ্রসর হইয়াছে। হাতপা, চক্ষু, দন্ত, হৃৎযন্ত্র প্রভৃতির মত একটা গোটা ও জটিল অঙ্গ বদলাইয়া দেওয়ার সম্ভাবনার দিকে বৈজ্ঞানিক কর্মীদের চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে এবং এতদ্বিষয়ে সফলতার দিক দিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানিগণ রহিয়াছেন সকলের পুরোভাগে।

এই প্রচেষ্টায় সাফল্যের মূলে রহিয়াছে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে কৃত্রিম উপায়ে সজীব ও সক্রিয় রাখিবার বাস্তব সম্ভাবনা। কয়েক বৎসর আগে মস্কো শহরে শারীর-বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রদর্শনীতে একটি কুকুরের দেহ-বিচ্ছিন্ন মস্তককে জীবন্ত রাখা হইয়াছিল। কৃত্রিম যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড ও শিরাধমনীর সাহায্যে মস্তকে রক্তচলাচল কার্যের অনুকল্প কাজ চলিতেছিল এবং মস্তকের কার্যক্ষমতা অব্যাহত ছিল। দেহবিচ্যুত মস্তকের প্রত্যেকটি অংশ —চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সম্পূর্ণ সক্রিয় ছিল। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় মৃত কুকুর কান নাড়াইত, উহার চক্ষুর পাতা মিটমিট করিত এবং আঁখিতারকাও সচল ছিল।

এই পরীক্ষায় জানা গেল জীবদেহের অনেক জটিল অঙ্গকেও দেহ-বিচ্যুত অবস্থায় সজীব রাখা সম্ভব। এই জাতীয় অন্যান্য পরীক্ষার দ্বারা ইহাও জানা গিয়াছে যে দেহের মৃত্যু হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সকল অঙ্গের কার্যক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া যায় না। দেহ মরিয়া গেলেও দেহের অনেক যন্ত্র অবিকৃত থাকিতে পারে। একটি জটিল জড়যন্ত্র বা মেশিন অচল হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তখনও উহার বিভিন্ন অংশ অটুট থাকা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, মানুষের দেহযন্ত্রের বেলাতেও এই কথা সত্য। মৃত্যুর কুড়ি দিন পরেও মৃতব্যক্তির হৃৎপিণ্ডে কার্যক্ষমতা ফিরাইয়া আনা সম্ভব

হইয়াছে। এমনি অবিকৃত সক্রিয়তা শিরা, ধমনী, নার্ভ, চক্ষুর কর্ণিয়া প্রভৃতি দেহাংশে বর্তমান থাকিতে দেখা গিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় মৃত ব্যক্তির দেহাংশ দ্বারা সজীব মানুষের দৈহিক অভাব পূরণের প্রচেষ্টা বহুলাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাতের ফলে অনেক সময় মানুষের নার্ভ এবং তন্তু ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; ইহার চিকিৎসার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে নার্ভ লইয়া সেগুলিকে সংরক্ষণ করা হইয়া থাকে। প্রয়োজন মত এই সংরক্ষিত নার্ভ আহত ব্যক্তির দেহে জুড়িয়া দেওয়া হয়। জুড়িয়া দিবার পর এই নার্ভ পুরাতন বিপর্যস্ত নার্ভকে পুনরায় সজীব করিয়া তোলে এবং পরবর্তীকালে উভয়ে অভেদ্যরূপে দেহ মধ্যে থাকিয়া যায়। ইহাতে অনেকের অকর্মণ্য অঙ্গে কার্যক্ষমতা দান করা সম্ভব হইয়াছে।

বাহ্যিক আঘাতে অনেকের চক্ষু নষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। এই সকল অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া ওডেসার অধ্যাপক ফিলাটোফ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে চক্ষুর অংশবিশেষ তুলিয়া লইয়া উহাদ্বারা এই চিকিৎসা করা হইয়া থাকে।

রোস্টভের অধ্যাপক নিকোলাই বোগোর‍্যাজ অস্ত্রচিকিৎসার যাদুকর বলিয়া পরিচিত। তিনি মাংসপেশী, তন্তু, হাড় এবং আরও অন্যান্য দেহাংশ একদেহ হইতে অন্যদেহে সংযোজনে সিদ্ধহস্ত। তিনি বহুবিধ বিস্ময়কর অস্ত্রচিকিৎসা করিয়াছেন। মৃতদেহ হইতে পুরুষাঙ্গ তুলিয়া লইয়া জীবিত মানুষের দেহে তাহা গ্রথিত করিবার পর উহাকে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষম করিয়া তোলা তাঁহার বিস্ময়কর অস্ত্রপ্রয়োগের অন্যতম দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক বোগোর‍্যাজের আর

একটি সাফল্যের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক সময়ে টিউমার জাতীয় রোগে অস্ত্রোপচারের ফলে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে গুলির আঘাতে চুরমার হইয়া যাওয়ার জন্য পায়ের হাড় খানিকটা কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, সেজন্য রোগী খোঁড়া হইয়া থাকে। অধ্যাপক বোগোর‍্যাজ এমন এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে পায়ের হাড়ের দৈর্ঘ্য বার চৌদ্দ সেন্টিমিটার বাড়ানো সম্ভব।

ডাক্তার লাপসিনস্কী একটি ইঁদুরের পা কাটিয়া ফেলিয়া অপর ইঁদুরের একখানা পা সেখানে লাগাইয়া দিবার কার্যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই পরীক্ষায় একটি ইঁদুরের পা কাটিয়া ফেলিয়া অপর একটি ইঁদুরের কাটা পায়ের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। হাড়, মাংসপেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু সব একটি একটি করিয়া ডাক্তার সূক্ষ্মভাবে ও অতি সতর্কতা ও যত্নের সহিত সেলাই করিয়া দিলেন। মাত্র সামান্য একটু চামড়া দিয়া বিচ্ছিন্ন নূতন পাখানা তাহার পূর্ব মালিকের দেহের সঙ্গে যুক্ত রহিল, যাহাতে প্রথমাবস্থায় রক্ত সঞ্চালন ঠিক মত চলিতে পারে। কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন পা খানা নূতন দেহের সহিত সম্পূর্ণ জোড়া লাগিয়া গেলে এই যোগ-সূত্রটুকু কাটিয়া দেওয়া হইল, তখন একের পা অন্যের দেহে আসিয়া তাহারই অধীন হইয়া পড়িল। কালক্রমে দেখা গেল এই পায়ের সকল অংশ সম্পূর্ণ সক্রিয় রহিয়াছে ও নিজের অপর পায়ের মতই ইঁদুরটি এই পা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতেছে। শুধু তাই নয়, ইঁদুরের দেহের অন্যান্য অঙ্গের মতই এই পাও দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল।

ডাক্তার লাপসিনস্কী বিশ্বাস করেন, যে অস্ত্রোপচার ইঁদুরের দেহে সম্ভব হইয়াছে তাহা মানুষেও সম্ভব হইবে। এই পরীক্ষালব্ধ

ফলের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। অদৃষ্টের দোষে বিকলাঙ্গ হইয়া যে জন্মিয়াছে কিংবা যে ব্যক্তি দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হইয়া গেল, বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার দেহকে নিখুঁত করিয়া দেওয়া হয়ত অসম্ভব হইবে না।

প্রাণীদেহে অঙ্গসংযোজনের বিবরণীতে অধ্যাপক সিনিৎসিনের সাফল্য সমধিক বিস্ময়কর। চক্ষুর কর্ণিয়া কিংবা অন্য কোন স্থানের চামড়া, হাড় প্রভৃতির পরিবর্তনের ব্যাপারের চেয়ে বেশী জটিলতা রহিয়াছে হৃৎযন্ত্র, বৃক্ক, প্লীহা, প্রভৃতি দেহাংশের পরিবর্তনে। অধ্যাপক সিনিৎসিন এই বিষয়ে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি প্রথমে একটি ব্যাঙ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। অন্য একটি ব্যাঙের হৃৎযন্ত্র কাটিয়া লইয়া উহাকে পরীক্ষাধীন ব্যাঙের হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বেই জুড়িয়া দেওয়া হইল। দুই মাস পরে দেখা গেল নূতন হৃৎযন্ত্র দিব্যি জোড়া লাগিয়া গিয়াছে এবং দুইটি হৃৎযন্ত্রই ব্যাঙের দেহে সুন্দর কার্য করিতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে জীবের থাকে একটি হৃৎযন্ত্র, এই ব্যাঙটি কিন্তু দুইটি হৃৎযন্ত্রের মালিক হইয়াও স্বভাবের কোন পরিবর্তন দেখাইল না।

অতঃপর অধ্যাপক আবার এক ব্যাঙের হৃৎযন্ত্র কাটিয়া বাহির করিয়া (মুখগহ্বরের রাস্তায়) সেখানে অপর ব্যাঙের হৃৎযন্ত্র লাগাইয়া দিলেন। এই অস্ত্রোপচার করিতে ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না এবং দুই তিন মিনিট মধ্যেই ব্যাঙটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে, বাহ্যত উহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হয় না।

এই প্রকার অস্ত্রোপচারে সাফল্য লাভ করিবার পর অধ্যাপক সিনিৎসিন কুকুর বিড়ালের অঙ্গে অনুরূপ পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে

আরম্ভ করিলেন। এই পরীক্ষাতেও তিনি দুই হৃৎযন্ত্রসম্বলিত কুকুর বিড়াল সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই জাতীয় পরীক্ষারও ভবিষ্যৎ অসামান্য সম্ভাবনায় পরিপুষ্ট।

অস্ত্রোপচারকার্যে সোভিয়েট সিদ্ধির তালিকায় মস্তিষ্কে অস্ত্র-চিকিৎসার কথা উল্লেখযোগ্য। অস্ত্রচিকিৎসকদের চেষ্টায় সোভিয়েট রাশিয়ায় এক্ষণে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের বিভিন্ন স্থানে সূক্ষ্ম ও জটিল অস্ত্রোপচার দ্বারা মানুষকে একান্ত অকর্মণ্য দশা কিংবা নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া পুনর্জীবন দান করা হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা অনেক সময়ে মস্তিষ্কে আঘাত পাইয়া থাকে; তাহারই ফলে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার বাহিরের জিনিষ প্রবেশ করিতে পারে ও মস্তিষ্কের নার্ভ-সংস্থানের গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হওয়া বিচিত্র নয় এবং অনেক সময় হয়ত বা তাহাদের চিন্তাশক্তি, স্মৃতি বা মানসিক স্থৈর্য লোপ পায়। এই অবস্থায় সোভিয়েট চিকিৎসকগণ সাফল্যের সহিত অস্ত্রোপচার দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে বহিরাগত আবর্জনা পদার্থ পরিষ্কার অথবা মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ নার্ভসংক্রান্ত বা অন্য প্রকার গোলযোগ দূর করিয়া থাকেন।

অস্ত্রোপচারকালে রোগী যাহাতে যথাসম্ভব কম উত্তেজনা বা আঘাত পায় সেজন্য লেনা স্টার্ণ নাম্নী এক মহিলা মস্তিষ্কে একপ্রকার ঔষধ ইন্‌জেকসান করিবার বিস্ময়কর ব্যবস্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

ভিনেশভস্কী-আবিষ্কৃত অস্ত্রোপচারস্থানকে অসার করিবার নূতন উপায়ের সাহায্যে খুবই নিরাপদে জটিল অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হইয়াছে।

উদর বা পাকস্থলীতে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীরা রক্তস্রাবের জন্য এত

দুর্বল হইয়া পড়ে যে, অনেক সময়েই অস্ত্রোপচারের ধাক্কা তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া তখনই মারা যায়। সোভিয়েট চিকিৎসকেরা এই প্রকার রোগীর ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়াই পুষ্টিকর আহার্য পদার্থ আহত ব্যক্তির দেহমধ্যে প্রবেশ করাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার ফলে রোগী সহজে সবল হইয়া উঠে এবং তখন অস্ত্রোপচার অনেকাংশে নিরাপদ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ার অস্ত্রোপচার চিকিৎসার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হাসপাতালে নীত হয়। ইহাদের চিকিৎসাকালে অস্ত্রচিকিৎসা-বিশেষজ্ঞকে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেই সকল সমস্যা নিরাকরণ-চেষ্টার ফলে বহু বিস্ময়কর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে পূর্ব হইতে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা না থাকিলে যুদ্ধকালে সহসা এত বেশী সাফল্য সম্ভব হইত না। পূর্ব হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্রে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য সোভিয়েট চিকিৎসকগণ চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহাদের গবেষণালব্ধ বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগের ক্ষেত্র যুদ্ধের মৃত্যুতাণ্ডবের মধ্যে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। মৃত্যুসাগর মন্থনের ভিতর দিয়াই জন্ম হইয়াছে অমৃতের।

শুনিতে হয়ত বিস্ময় লাগিবে যে, সোভিয়েট সমরাঙ্গনে আহত সৈনিকদের মধ্যে শতকরা আটাত্তর জন পুনরায় পূর্ণ কার্যক্ষমতা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া গিয়াছে এবং আহতদের মধ্যে শতকরা দেড় জনের বেশী মারা যায় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের আঘাত বা ক্ষত প্রায়শই মারাত্মক এবং নানাকারণে

জটিল হইয়া থাকে। এই সকল আহতকে জীবনদান ও তাহাদের কার্যক্ষম করিয়া তোলা অসামান্য কৃতিত্বের ব্যাপার সন্দেহ নাই। সারা পৃথিবীর লোক বিস্মিত হইয়া এই সব বিবরণ শ্রবণ করিয়াছে। এই বিস্ময়কর সিদ্ধির মূলে রহিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ায় শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্যক ও ব্যাপক উন্নতির ব্যবস্থা ও সোভিয়েট জনগণের সাধারণ উন্নত স্বাস্থ্য। সোভিয়েট রাশিয়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও আলোচনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ আছে। ইহার অধীনেই সকল গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়। রাশিয়ায় কোন নূতন চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলেই অবিলম্বে তাহা ব্যাপকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

একথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগের ফলেই দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ে রাশিয়ায় কোন ব্যাপক মহামারী দেখা দেয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বরূপ দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

সোভিয়েট চিকিৎসকগণের গবেষণাকার্যের মধ্যে আপাত-মৃতের দেহে পুনঃ প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়। ডাক্তার নেগোভস্কীর প্রক্রিয়ায় মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিয়াছে একথা অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও ইহা মিথ্যা নহে। লালফৌজের সৈনিক ভ্যালেন্‌টিন আহত অবস্থায় রক্তপাতের ফলে মারা গেল (৩রা মার্চ, ১৯৪৪)। হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাহার দেহে মৃতের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইল— শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইল, হৃৎযন্ত্র নিশ্চল হইয়া গেল। কোন ক্রমেই ভ্যালেন্‌টিনের দেহে প্রাণের চিহ্ন আছে একথা বলিবার উপায়

ছিল না। কিন্তু নেগোভস্কীর চেষ্টায় ভ্যালেন্টিনের দেহে প্রাণের লক্ষণ ফিরিয়া আসিল, ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া ভ্যালেন্টিন কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া গেল। কবরের মাটির নীচে যাহার থাকিবার কথা আজ সে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়াও আবার রক্তমাংসের দেহেই জীবনযাপন করিতেছে।

বিজ্ঞানের জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে মানবদেহ একটি যন্ত্র মাত্র। কোন কারণে হঠাৎ উহার কার্য বন্ধ হইয়া গেলেই উহা চিরতরে অকর্মণ্য হইয়া গেল—বৈজ্ঞানিক যুক্তিশাস্ত্র একথা স্বীকার করিতে রাজী নহে। হঠাৎ রাস্তার মাঝে চলিতে চলিতে মোটর গাড়ী বিকল হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেখানেই তাহার চিরসমাধি হইয়া থাকে কি? ঘড়ির টিক টিক একবার বন্ধ হইলেই উহার জীবনান্ত হয় না—ওস্তাদ কারিগরের হাতে পড়িলে উহা আবার সচল হয়। জড়-যন্ত্রের যদি মেরামত করা চলে—মানুষের দেহযন্ত্রে অনুরূপ প্রক্রিয়াই বা সফল হইবে না কেন? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য ডাক্তার নেগোভস্কী আত্মনিয়োগ করিয়া আট বৎসরে প্রায় আড়াই শত প্রাণীর উপর পরীক্ষা করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহারই হাতে ভ্যালেন্টিন মৃত্যুর পরে আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

দেহযন্ত্রের সজীবতার প্রধান অভিব্যক্তি দুই প্রকার—শ্বাসক্রিয়া ও হৃৎযন্ত্রের কার্য। শ্বাসক্রিয়ায় দেহমধ্যে বাতাস গৃহীত হয়, বায়ুর অন্যতম উপাদান অক্সিজেন শরীরের ভিতরে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। হৃৎযন্ত্রের কার্য এই রক্ত ও অক্সিজেনকে দেহের প্রতি অঙ্গে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই দুই যন্ত্রের যে-কোন একটি অচল হইলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। এই যন্ত্রদ্বয়ের বিকল হইবার নানা হেতু থাকিতে পারে। বিভিন্ন রোগে ইহাদের বিকল করিয়া দিতে

পারে। কিন্তু এমন অনেক সময় ঘটে যে আকস্মিক কোন কারণে এই যন্ত্রদ্বয় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিয়াও হঠাৎ অচল হইয়া যায়। যেমন জলে ডুবিয়া বা অন্য কোন কারণে শ্বাসরোধ হইলে ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াই মানুষের মৃত্যু হয়, কিংবা অত্যধিক রক্তপাতের ফলে হৃৎযন্ত্রের কার্যক্ষমতা থাকে না। এই সকল ক্ষেত্রে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব বলিয়া নেগোভস্কী বিশ্বাস করেন।

নেগোভস্কীর প্রক্রিয়া খুব সহজ এবং ইহাতে নূতনত্বও খুব বেশী নাই। কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার ব্যবস্থা কিম্বা রোগীর দেহে রক্ত সরবরাহের পদ্ধতি চিকিৎসাশাস্ত্রে ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল। নেগোভস্কী এই দুইটি প্রক্রিয়া দেহমধ্যে একই সময়ে চালু করিয়া মৃতদেহে প্রাণ ফিরাইয়া আনা সম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

হাঁপরের মত একটি সরল যন্ত্রের সাহায্যে মুখের ভিতর দিয়া বাতাস ঠেলিয়া দেওয়া হয় ফুসফুসে। বাতাসের চাপে ফুসফুস ফাঁপিয়া উঠে এবং ইহার ফলে মস্তিষ্কের যে নার্ভগুলি শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে উহারা উত্তেজনা পায় ও সক্রিয় হইয়া উঠে। ইহাদের উত্তেজনা আবার হৃৎযন্ত্রের নার্ভগুলিকে সক্রিয় করিয়া তোলে। অপরদিকে হৃৎযন্ত্রকে চালাইবার জন্য আবার রক্তসরবরাহের ব্যবস্থাও একই সময়ে চলিতে থাকে। নেগোভস্কীর উদ্ভাবিত রক্ত-সরবরাহ ব্যবস্থা কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি হইতে অন্য রকম।

হৃৎযন্ত্র হইতে ধমনীর ভিতর দিয়া রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া যায় এবং দেহকোষের দূষিত রক্ত আবার শিরার পথে হৃৎযন্ত্রে ফিরিয়া আসে বিশুদ্ধ হইবার জন্য—মানুষের শরীরে এমনি করিয়া রক্ত-সংবহনতন্ত্রের কাজ চলিয়া থাকে। বাহির হইতে যখন দেহে



প্রয়োজন হওয়ায় ব্লাড-ব্যাঙ্কের গাড়ীতে করিয়া বোতলপূর্ণ রক্ত পৌছাইয়া দেওয়া হইতেছে।

রক্ত সরবরাহ করা হয় তখন শিরাতে রক্ত ইন্‌জেকসন করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ঐ রক্ত হৃৎযন্ত্রে পৌঁছিতে পারে। নেগোভস্কীর পদ্ধতিতে শিরাতে রক্ত ইন্‌জেকসন না করিয়া করা হয় ধমনীতে এবং বাহির হইতে চাপপ্রয়োগে উহাকে হৃৎযন্ত্রে পাঠান হয়। স্তব্ধীভূত যন্ত্র এই রক্তের চাপে ও পূর্বকথিত নার্ভের উত্তেজনায় আবার সক্রিয় হইয়া থাকে। হৃৎযন্ত্র কার্যকরী হইবার পর প্রচলিত নিয়মে শিরাতে রক্ত ইন্‌জেকসন করা হয়।

এই রকম প্রক্রিয়া অবলম্বনে সদ্যোমৃত ব্যক্তির হৃৎযন্ত্র ও ফুসফুসকে পুনরায় কার্যক্ষমতা ফিরিয়া পাইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, হৃৎযন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কোষের বিশেষত মস্তিষ্ককোষের বিনাশের সূচনা হয় এবং স্বল্পকাল মধ্যেই উহাদের অনেকের বিলয় ঘটে। মস্তিষ্ককোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে নেগোভস্কীর প্রক্রিয়ায় কোন সুফল আশা করা যাইতে পারে না। সেইজন্য মৃত্যুর পাঁচ ছয় মিনিট মধ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব। মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করিলে এই প্রক্রিয়া আরও বেশী কার্যকরী হইয়া থাকে।

মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ট্র্যাজেডী অকালমৃত্যু তথা আয়ুর স্বল্পতা। জীবনের মেয়াদকে দীর্ঘতর করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলে মানবের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হইবে। নিমিত্ত মাত্র উপলক্ষ করিয়া দেহীর প্রাণবায়ু দেহবিমুক্ত হইয়া থাকে একথা মিথ্যা না হইলেও মৃত্যুর কারণকে একান্ত দৈবাধীন মনে না করিবারও হেতু আছে। চেষ্টা করিলে আসন্ন মৃত্যুকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া সম্ভব। দুর্ঘটনায় দেহযন্ত্রের বিকল অবস্থা, রোগ ও

নার্ভঘটিত গোলযোগ, ইহারাই জীবনের মেয়াদ হ্রাস করিয়া দেয়। মানুষ চিরকাল অমৃতের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে, অমরতাদানের সে সুধাবিন্দু অবাস্তব হইতে পারে, কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ বিবিধ যন্ত্র ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা বৃদ্ধি বা উহাদের সংস্কার করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলে যে মানুষের আয়ুষ্কাল দীর্ঘতর করা সম্ভব একথা মোটেই স্বপ্নবিলাস নহে।

সোভিয়েট রাশিয়ার অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার বোগোমোলেৎস্ সম্প্রতি (জুলাই ১৯৪৬) পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে তিনি এক সিরাম আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাহার প্রয়োগে মানুষের আয়ুষ্কাল দেড়শত বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই সিরামের প্রভাবে দেহের তন্তুসমূহ নবযৌবনপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং ইহার ফলে জরার প্রকোপকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব। তবে একথা সত্য যে সিরাম প্রয়োগে সুফল পাইতে হইলে এবং দীর্ঘতর জীবনের কামনা করিলে অন্য প্রকারে শরীরের যত্ন লওয়া প্রয়োজন। জরাজীর্ণ বৃদ্ধের দেহে সিরামের সুফল আশা করা নিষ্ফল।

রাশিয়ার চিকিৎসা বিষয়ক উন্নতির কথা বলিতে হইলে প্যাভলোভের নামোল্লেখ না করিলে অনুচিত হইবে। যদিও প্যাভলোভের আবিষ্কার বা গবেষণার বিষয় এখনও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতি বা রোগের চিকিৎসায় প্রত্যক্ষ ও ব্যাপকভাবে বাস্তব প্রয়োজনে লাগিতেছে না, তবুও একথা আশা করা যায় প্যাভলোভের আজীবন সাধনালব্ধ সত্য ভবিষ্যতে মানুষকে অনেক দুঃখদুর্দশা হইতে মুক্তি দিবে। মস্তিষ্কের জটিল নার্ভের কার্যাদি এবং চৈতন্য ও অনুভূতির গোপন রহস্যের সন্ধানে প্যাভলোভ আত্মনিয়োগ

করিয়াছিলেন। প্যাভলোভের গবেষণা ও চিন্তাধারার সম্যক বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নহে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নতি প্রসঙ্গে এইটুকুমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্যাভলোভের আবিষ্কারের সাহায্যে নার্ভ ও মস্তিষ্ক, তথা চরিত্র ও প্রবৃত্তিগত অনেক রোগের চিকিৎসা নূতন প্রণালীতে করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। অনাগত যুগের কর্মীদের চিন্তাস্রোত যে নূতন ধারায় প্রবাহিত হইবে তাহারই সূচনা করিয়াছেন মনীষী প্যাভলোভ। রোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিবার নবতম পন্থার সন্ধান হয়ত প্যাভলোভের চিন্তাধারার মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

কৃষি, শিল্প বা অর্থনীতি ক্ষেত্রে সোভিয়েট বিজ্ঞানের কার্য ও কৃতিত্বের সুফল প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করিতেছে বা করিবে রাশিয়ার জনগণ; কিন্তু আয়ুর্বিজ্ঞানে সোভিয়েট রাশিয়ার দানের অংশ গ্রহণ করিবে নিখিল বিশ্বের জরাব্যাধি-প্রপীড়িত অগণিত মানব—আজ না হয়, অদূর ভবিষ্যতে।

এখানে বিজ্ঞান একান্তভাবে মতবাদ বা আদর্শভেদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন কল্যাণের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেছে।

দেশ ও জাতির, কিংবা মত ও পথের ভেদাভেদ ভবিষ্যতে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে কে জানে—তাহা অনিশ্চয়তার গহ্বরে নিমজ্জিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পৃথিবীর পরিস্থিতি যাহাই হোক না কেন, ক্ষমতার দাম্ভিক প্রতিযোগিতার পরিণামে যদি ইতিমধ্যে মানবজাতির অবসান না ঘটে তবে সোভিয়েট চিকিৎসা-বিশারদগণের দান জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মানুষকে অমৃতের পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিবে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যন্ত্ররাক্ষসীর কল্যাণী মূর্তি

সোভিয়েট জনজাগরণের ফলে রাশিয়ার শিল্প ও কৃষিপদ্ধতির বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠার মূলকথা ব্যাপক যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। কৃষি-উন্নয়নের ভিতরেও যন্ত্রের দান অনেকখানি। শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কার্যকরী রূপ দিয়াছে যন্ত্র—মানুষের অসাধ্য কাজকে সুসাধ্য করিয়াছে। শিল্প-প্রচেষ্টার প্রাথমিক কার্য ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান, কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রের সাহায্য দরকার হইয়াছে। কৃষিকার্যের ব্যাপারেও ঠিক ঐ কথা সত্য। লেবরেটরীতে বসিয়া একদল বৈজ্ঞানিক কর্মী যদি নূতন কৃষিপদ্ধতির সত্যকে আবিষ্কার করিয়া থাকেন তবে তাহাকে ব্যাপক বাস্তব রূপ দিয়াছে যন্ত্র। লেবরেটরীর বিজ্ঞানের সত্যকে কার্যকরী জনকল্যাণ-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিতে আবার যন্ত্রের সাহায্য লইতে হইয়াছে।

আমরা যন্ত্রযুগে বাস করি। বর্তমান সভ্যতা যান্ত্রিক সভ্যতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যন্ত্র মানুষের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে—প্রতি অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়কে অধিকতর কার্যক্ষম করিয়াছে। মানুষের হাতে দিয়াছে কর্মক্ষমতা, পায়ে দিয়াছে গতি। কিন্তু যন্ত্রের এই সর্বাঙ্গীণ শক্তিমত্তা সমগ্র পৃথিবীর জনগণের কল্যাণে আসিয়াছে কি? নিশ্চয়ই না। তাহা যদি আসিত তবে বিজ্ঞান যন্ত্রদানবের জন্ম দিবার অপবাদ পাইত না—যন্ত্রদেবতার সৃষ্টি করিবার গৌরব লাভ করিত। যন্ত্রের মধ্যবর্তিতায় পৃথিবীতে শক্তির প্রাচুর্য প্রবহমান হইয়া থাকিলেও মানুষের দৈন্য দূর হয় নাই। কেন এই বৈষম্য—প্রাচুর্যের মাঝে কেন এই অনটন!

যান্ত্রিক ব্যবস্থার আনুকূল্যে পৃথিবীর যে-দেশগুলি তথাকথিত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে সেইগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে। সোভিয়েট রাশিয়া ভিন্ন অন্য সকল দেশের জনগণ যন্ত্রকে শত্রু বলিয়াই মনে করে। কিন্তু কেন? নূতন আবিষ্কার, নবতম যন্ত্র লইয়া আসে প্রভূত কার্যক্ষমতা—যাহার ফলে শতসহস্র লোক বেকার হইয়া বসে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একটি কাচের কারখানায় যন্ত্রের সাহায্যে একটি শ্রমিক ঘণ্টায় তিন হাজার বোতল তৈয়ারী করিতে পারে—যন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বে ঐ একই কাজে লাগিত ৭৭জন কর্মী। সুতরাং যন্ত্রস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ৭৬ জন লোকের কাজে জবাব হইল। এই কারণেই নূতন যন্ত্রের নাম শুনিলেই মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, অভাব ও দারিদ্র্যের চিত্র ভাসিয়া উঠে।

শুধু কি এইটুকুই? যন্ত্ররাক্ষসীর জঠর জ্বালার নিবৃত্তি করিতে বিশ্বমানবের অন্ন গেল, শিক্ষা গেল, নীতি গেল, স্বাস্থ্য গেল। দারুণ নিরাশায় কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর,
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা!"

যন্ত্রের এই যে সর্বগ্রাসী করালী মূর্তি—এজন্য দায়ী মুষ্টিমেয় একদল স্বার্থান্ধ মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধি। প্রাচুর্যের মাঝে শোচনীয় দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ হেতু বিজ্ঞান ও অর্থনীতির যোগাযোগের অভাব।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যখন যন্ত্রের প্রতি এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল, জারশাসিত রাশিয়ার অবস্থাটা তখন আরও

নৈরাশ্যজনক। জারের রাষ্ট্রে শুধু যন্ত্রভীতি ছিল তাহাই নহে, যন্ত্রের স্রষ্টা কারখানার প্রতিও সমধিক বিদ্বেষ ছিল। জার-শাসনতন্ত্র দেখিয়াছিল যন্ত্রের কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অন্যান্য দেশে সমাজের ভিতরে তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও বিপ্লবী নিঃস্ব এই দুই শ্রেণীবিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাই জার-শাসনতন্ত্রে যান্ত্রিক কারখানার প্রতিষ্ঠা কোন উৎসাহ পায় নাই। সেজন্য যথেষ্ট কাঁচামাল দেশে থাকা সত্ত্বেও সামান্য কাস্তেখানাও রাশিয়ায় তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা ছিল না।

সোভিয়েট য়ুনিয়নে এই অবস্থা ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি প্রচলনের পূর্বে দেশের সম্পদবৃদ্ধির আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দেশের খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণসম্পদ খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেইগুলির উদ্ধারকার্যে যন্ত্রের সাহায্য গৃহীত হইয়াছিল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি সোভিয়েট রাশিয়ায় সর্বদা পাশাপাশি চলিতেছে। সুতরাং যন্ত্রের শক্তি দেশে প্রাচুর্যই আনিয়াছে, দৈন্য ও দুর্দশা নহে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে যন্ত্রের ব্যবহার মানুষকে আরাম দিবার জন্য, পুঁজিপতির আর্থিক প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। যন্ত্র যত বেশী হইবে কাজ তত সহজ হইবে, সময় লাগিবে কম। মানুষের খাটুনী কমিবে, জীবনে আসিবে অবসর, আনন্দ ও সরসতা। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির দুঃসহ নিপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষের জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে। সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্প কারখানায় দৈনিক খাটুনীর পরিমাপ জনপ্রতি সাত ঘণ্টা। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এই ব্যবস্থা নাই। যন্ত্রের সাহচর্য সোভিয়েট রাশিয়ায় মানুষকে মানুষের পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাকে পশুর স্তরে নামাইয়া দেয় নাই। এই কারণে সোভিয়েট রাশিয়ায় যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা রহিয়াছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির ‘স্বাভাবিক অধিকার’ বলিতে এইগুলি স্বীকার করে ঃ

কাজ করিবার সুযোগ

বিশ্রামের ব্যবস্থা

শিক্ষার সুযোগ

বার্ধক্য ও রুগ্ন অবস্থায় আর্থিক সঙ্গতি

বিজ্ঞান ও অর্থনীতি, যন্ত্র ও রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রত্যেক মানুষের জন্য এইগুলির ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছে। সোভিয়েট শিল্প ও কৃষি বিভাগের লক্ষ্য ও কর্তব্য হইল প্রত্যেক মানুষকে খাদ্য, পরিধেয়, গৃহ, এবং সভ্য ও সংস্কৃত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার সরবরাহ করা।

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের আর্থিক উন্নতিকে দেশের শিল্প ও কৃষিপ্রচেষ্টার মূলনীতি না করিয়া জনগণের প্রয়োজনকে একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিলে যন্ত্র মানুষের হিতার্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। সোভিয়েট রাষ্ট্র এই লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে।

একটা সমগ্র জাতি যখন অধঃপতিত অবস্থা হইতে জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিতে চায়, তাহার প্রয়োজন মিটাইতে বহুবিধ জিনিষের ব্যাপক উৎপাদন অনিবার্য হইয়া পড়ে। প্রথমত দরকার হয় খাদ্যসম্ভারের। পূর্বতন রাশিয়ায় খাদ্যদ্রব্যের কোন শিল্প ছিল না। দেশের অনুন্নত অবস্থা ও দারিদ্র্য, বৃহৎ নগরের স্বল্পতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা প্রণালীর নিম্নমান—এই রকম সবগুলি কারণ খাদ্যশিল্পের প্রয়োজনীয়তাকে বড় হইতে দেয় নাই। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে এই অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারী করিবার জন্য কারখানায় যে পরিমাণ কাঁচামাল বা কৃষিজাত দ্রব্যের দরকার

বিজ্ঞানের চেষ্টায় তাহা ক্রমে প্রাচুর্যে দাঁড়াইল। শত সহস্র কৃষি-প্রতিষ্ঠান, অগণিত পশুশালা ও গোগৃহ, বহুসংখ্যক মৎস্যপালনস্থান, শাকসবজী, ফলমূল, চা প্রভৃতির অসংখ্য বাগান—এইগুলি বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত হইয়া দেশের সম্মুখে প্রচুর খাদ্যসম্ভার উপস্থিত করে। সহস্রাধিক কারখানায় যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য দ্রুত তৈয়ারী ও সংরক্ষিত হইয়া জনগণের চাহিদা মিটাইতেছে। দেশে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল গম, ধান্য প্রভৃতি খাদ্যশস্যের। পূর্বতন রাশিয়ায় অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই থাকিত। সোভিয়েট রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে খাদ্যাভাবে রাশিয়ার চরম দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোধ হয় রাশিয়ায় খাদ্যাভাব হয় নাই।

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রাশিয়ায় মাখন বিক্রী শতকরা ২৬০ ভাগ বর্ধিত হইয়াছে, পাঁচগুণ ডিমের চাহিদা মিটান হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় আহার্য বলিতে কেবল 'দুমুঠো ভাত' বুঝায় না। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মানুষের যাহা প্রয়োজন তাহার কোনটারই অভাব নাই বা হয় না।

সোভিয়েট জনগণের খাদ্যসূচী ক্রমশ অধিকতর পুষ্টিকর উপাদানে সমৃদ্ধ হইতেছে। প্রোটিন খাদ্যের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে ১০০ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বকালীন জার্মানীর জনসাধারণের খাদ্যে জনপ্রতি প্রোটিনের পরিমাণ ৩৫-৪০ গ্রামের বেশী ছিল না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পুষ্টিকর খাদ্য প্রত্যেক ব্যক্তির সহজলভ্য হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে কৃষকের খাদ্যবিষয়ক অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে,

চার বৎসরের (১৯৩৩-৩৭) মধ্যে তাহাদের খাদ্যদ্রব্যে মাংস, মৎস্য, চর্বিজাতীয় উপাদান, শর্করা ও মিষ্টান্নাদির পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে।

সর্ব জাতীয় শ্রমিক ও কর্মীর প্রধান খাদ্য দ্রব্যগুলি ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের পরিমাণের অনুপাতে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে শতকরা কত ভাগ বেশী গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নের হিসাবে পাওয়া যাইবে :

খাদ্যবস্তু	...	...	**শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি**
কালো রুটি	...	...	—২৯·০
সাদা রুটি	...	...	+৭৬·৭
ভালো রুটি	...	...	+২৫·৮
ফল	...	...	+২১৬·২
মাংস	...	...	+৩৯০·০
মাখন	...	...	+২০১·৬
ডিম্ব	...	...	+২০৮·৪

খাদ্যবস্তুর সঙ্গে স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

খাদ্যের পরে প্রয়োজন পরিধেয়ের। জারের আমলে রাশিয়ার কৃষকের পায়ে জুতা কদাচিৎ দেখা যাইত। তাহারা খালি পায়ে চলিত বা পায়ে খড় বা নেকড়া জড়াইত। ১৭ কোটি লোকের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ২ কোটি জোড়া জুতা তৈয়ারী হইত। কাজেই দেখা যাইতেছে মাত্র ধনিক সম্প্রদায়েরই জুতা পরিবার সৌভাগ্য হইত। প্রতি ৮।৯ জনের মধ্যে এক ব্যক্তির পায়ে জুতা উঠিত। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তির গড়ে ২·৬ জোড়া জুতা আছে, ব্রিটেনে আছে ২·২, জার্মানীতে ১·১। সোভিয়েট আমলে ১৯৩৭

খ্রীস্টাব্দে প্রত্যেক রুশের জন্য ১ জোড়া জুতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—১৯৪২এর পরিকল্পনায় জনপ্রতি দুই জোড়ার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

কোন দেশের সভ্যতার স্তর বিচারের জন্য তদ্দেশে ব্যবহৃত 'সাবান'এর পরিমাণকে বিবেচনা করিবার একটি প্রচলিত কথা আছে। একথা খুবই সত্য যে, যে-জাতি যত বেশী সাবান ব্যবহার করে তাহাতে তাহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদির ও স্বভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় সাবানের চাহিদা ৮ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গড়ে তিন কিলোগ্রাম সাবান সরবরাহ করা হইয়াছিল।

কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিলে বুঝিতে হইবে সেই জিনিসের উৎপাদন বর্ধিত হইয়াছে; অথবা লোকের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার বাজার দর পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে-সময়ে জার্মানীতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমে বর্ধিত হইয়া গড়ে দেড়গুণ হইয়াছিল সেই একই সময়ে (১৯৩৪-৩৭) রাশিয়ায় রুটি ও মাখনের দাম ৫০%, ডিম ৭৫%, মাংস ৬৩.৩%, চিনি ২৭.৩% কমে। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে সকল প্রকার কর্মীর বেতন ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের আয়ের তুলনায় ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ১৯৬.৪% ও ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ৩৭১.৪% বর্ধিত হয়।

ভারতের প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা মিঃ এস, এ, ডাঙ্গে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য সোভিয়েট দেশে গিয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেদেশে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা

করিতে গিয়া একস্থানে সোভিয়েট শ্রমিকদের উপার্জন ও জীবন-যাত্রার মান সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ—

"স্ট্যালিন মোটর কারখানা বিশ্ববিখ্যাত। যুদ্ধের সময় এখানে ট্যাঙ্ক, ট্রাক ইত্যাদি নির্মিত হইত। বর্তমানে মোটর গাড়ী নির্মাণের জন্য এই কারখানার পুনর্গঠন চলিয়াছে। এই কারখানায় তৈয়ারী গাড়ীগুলির সঙ্গে পাল্লায় আমেরিকার সব চেয়ে সেরা গাড়ীগুলিও হার মানে। আমরা একটি পুরা দিন এই কারখানায় কাটাইয়াছি।

এই কারখানার শ্রমিকের গড়পড়তা মাসিক বেতন প্রায় ৫২৫৲ (৮৫০ রুবল্)। অনিপুণ শ্রমিকের মাসিক বেতন ৩১২½-৩৭৫ টাকা। আর নিপুণ শ্রমিক, যন্ত্রবিদ্ ইত্যাদির বেতন মাসে ১৭৭৫—২১৮৮ টাকা।

অন্যান্য শিল্পে শ্রমিকদের মাথা প্রতি বেতনের (১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের) একটা গড়পড়তা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

শিল্প	দৈনিক বেতন
কয়লা খনি	১১৸৵৬ পাই
খাদ্যশিল্প	৭৸৶০ আনা
লৌহখনি	১১৸৵৩ পাই
সমস্ত শিল্পের গড়	১০।৵১০ পাই

অবশ্য এখানে জানিতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এই বেতনে কি পরিমাণ জিনিস তাঁহারা কিনিতে পান। একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে বলিলেন, তাঁহার ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা—এখানকার দরদস্তুর অত্যন্ত চড়া, 'চোরা-বাজারের' প্রাচুর্ভাব এবং আরও কত কি। ব্রিটেনে এখানকার তুলনায় নাকি দাম কম।

এই ইংরেজ বন্ধুটি আমার সঙ্গে একটি সোভিয়েট দোকানে সিল্কের কাপড় কিনিতে গিয়াছিলেন। দেখা গেল, ব্রিটেনের তুলনায় এখানকার দাম অনেক কম।···

মস্কৌর একজন সূতাকল শ্রমিকের পারিবারিক বাজেটের কথা ধরা যাক। বৃদ্ধা পিতামহী (পেন্সন পান) স্ত্রী (কারখানায় কাজ করেন) আর দুইটি শিশু সন্তান লইয়া তাঁহার পরিবার। এই পরিবারের মাসিক আয় ৮৪৩৸৹ আনা। খাদ্য, বাড়ীভাড়া, আলো ইত্যাদি বাবদ মাসে ব্যয় ৩৪৩৸৹ আনা। ভাল কাপড় চোপড় কিনিবার ব্যয় ১৮৭৷৹ আনা। এইসব প্রয়োজনীয় খরচ বাদে বিলাসব্যসনে ব্যয় করিবার মত ৩১২৷৹ আনা তাঁহার হাতে থাকে।

বিজলী বাতি, রেডিও ইত্যাদি সম্বলিত একটি তিন কামরার ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া ৩৬ টাকা। রুটি পাঁচ আনা পাউণ্ড আর মাছের সের ১।৹ পাঁচসিকা।

এগুলি অবশ্য যুদ্ধের সময়কার দামের তালিকা; বর্তমানে দাম অনেক কমিয়াছে। গত জুলাই মাসেই (১৯৪৬) শতকরা ৪০ টাকা দাম কমান হইয়াছে। তাই বলিয়া আমাদের দেশের মত দোকান হইতে মাল অদৃশ্য হইয়া যায় নাই।

এখানে আর একটি বিষয় বলা দরকার যে, সোভিয়েট

দেশে জিনিসপত্রের দাম কমিলেও বেতনের হার কমে নাই, বরঞ্চ বাড়িয়াই চলিয়াছে।" [People's Age, Nov. 3, 1946]

কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যোৎপাদনে জারের আমলের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে কি বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে নিম্নের হিসাবে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়াতে জন প্রতি যে হারে যতটুকু বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইত তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক-সপ্তমাংশ ও জার্মানীর এক-পঞ্চমাংশ। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার উৎপাদন হার আমেরিকার এক-পঞ্চমাংশে ও জার্মানীর এক তৃতীয়াংশে উন্নীত হয়।

কাঁচালোহের জনপ্রতি উৎপাদন হার ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ায় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একাদশ ভাগের এক ভাগ, জার্মানীর এক-অষ্টমাংশ, ব্রিটেনের এক অষ্টমাংশ ও ফরাসীর এক-চতুর্থাংশ। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার উৎপাদন হার মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর একতৃতীয়াংশ ও ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অর্ধাংশে পৌঁছিয়াছিল।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ায় যে কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছিল তাহা জনপ্রতি হারে আমেরিকার ছাব্বিশ ভাগের এক ভাগ, ব্রিটেনের একত্রিশ ভাগের এক ভাগ। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে এই হার যথাক্রমে একপঞ্চমাংশ ও এক-সপ্তমাংশে পৌঁছিয়াছিল।

নিম্নোদ্ধৃত তালিকাদ্বয়ে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন হার দেওয়া হইল। এই হিসাবে মোট উৎপন্নদ্রব্যকে দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করা হইয়াছে :

জনপ্রতি উৎপাদন হার

(শিল্পজাত দ্রব্যাদি—১৯৩৭)

দেশ	বৈদ্যুতিক শক্তি	কাঁচা লৌহ	ইস্পাত	কয়লা	সিমেণ্ট
	কিলো-ওয়াট	কিলোগ্রাম	কিলোগ্রাম	কিলোগ্রাম	কিলোগ্রাম
সোভিয়েট রাশিয়া	২১৫	৮৬	১০৫	৭১৭	৩২
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১১৬০	২৯২	৩৯৭	৩৪২৯	১৫৬
জার্মানী	৭৩৫	২৩৪	২৯১	৩৩১৪	১৭৩
ব্রিটেন	৬০৮	১৮৩	২৭৯	৫১৬৫	১৫৪
জাপান	৪২১	৫০	৬২	৬৪৩	৬০

জনপ্রতি উৎপাদন হার

(নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য—১৯৩৭)

দেশ	তুলাজাত দ্রব্য	পশম দ্রব্য	চামড়ার জুতা	কাগজ	চিনি	সাবান
	গজ	গজ	জোড়া	কিলোগ্রাম	কিলোগ্রাম	কিলোগ্রাম
সোভিয়েট রাশিয়া	১৭	·৬৫	১	৫	১৪	৩
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৬৩	·৩	২·৬	৪৮	১২	১২
জার্মানী	—	—	১·১	৪২	২৯	৭
ব্রিটেন	৬৫	৮	২·২	৪২	৮	১১
জাপান	৬২	—	—	৮	১৭	—

এখানকার তালিকায় বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে রাশিয়ার সমৃদ্ধি যত বেশী হইয়া থাকুক উহা এখনও অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর দেশের তুলনায় অনেক কম। তবুও বোধ হয় রাশিয়ার জনগণ অন্যান্য দেশের জনগণের তুলনায় বেশী সুখে আছে। এখানে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

পূর্বপ্রদত্ত ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের হিসাবের সহিত তুলনা করিলে বিশ বৎসর কালের ভিতর রাশিয়া কি অসাধ্য সাধন করিয়াছে তাহা উপলব্ধি হইবে। এখানে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে পূর্বপ্রদত্ত হিসাব সবই লোকসংখ্যার আনুপাতিক হারে। রাশিয়ার লোকসংখ্যা ১৭ কোটির উপরে। অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী। এই সংখ্যার একটা বিরাট অংশ জারের আমলে ছিল যাযাবর। তাহাদের গৃহ ছিল না, কৃষি ছিল না, শিল্প ছিল না, শিক্ষা সভ্যতা কিছুই ছিল না। আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় শিল্প ও কৃষিজাতের দ্রব্যের কোনটাই ইহাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। রাশিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের উপরোক্ত আনুপাতিক হারে ইহাদের অংশও রহিয়াছে। যাহাদের কিছু ছিল না, সেই সর্বহারা নিঃস্বদের প্রাপ্য অংশ ধরিয়া যদি সোভিয়েট রাশিয়ার জনপ্রতি সম্পদ অন্যান্য দেশের তুলনায় কমই হয় তবুও তাহাতে সোভিয়েটের কৃতিত্ব কিছুমাত্র কমে না এবং প্রকৃতপক্ষে এই হিসাবের কমতি যে জাতীয় সম্পদ হিসাবে কিছুমাত্র কম নয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে দ্বিতীয় মহাসমরে। জার্মানীর মত সমৃদ্ধ দেশকেও সোভিয়েট শক্তির কাছে পরাভূত হইতে হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় দেশের একাংশ জার্মানীর করতলগত হওয়ার পরও সোভিয়েটের শিল্পোদ্যম এতটুকু কমিয়া যায় নাই;

বরঞ্চ যুদ্ধের সরঞ্জাম, কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন ক্রমশ বর্ধিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক নূতন শিল্পকেন্দ্র সংগঠিত হইয়াছিল। তিন-চার মাসের মধ্যে এক একটা সমগ্র কারখানা তৈয়ারী হইয়া শিল্পসামগ্রী সরবরাহ করিয়াছিল। যে বিরাট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা একটা দরিদ্র দেশকে বিশ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে পারিয়াছিল সেই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাই তাহাকে আপদ্‌কালে শুধু আত্মরক্ষার অস্ত্র দিয়াছে তাহাই নয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানও করিয়াছে। মারণাস্ত্রের বা সমরসম্ভারের কথা বাদ দিলেও যুদ্ধকালীন শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্যে একাডেমী অফ সায়েন্সেসের কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। একস্থান হইতে অন্যত্র কারখানা স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে নূতন অঞ্চলে নূতন খনি ও খনিজপদার্থ আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ ও বক্‌সাইটের খনির আবিষ্কার ও নূতন উপায়ে কৃত্রিম রবার তৈয়ারীর ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে ইয়াকুটিয়া সভ্য জগতের কাছে অজ্ঞাত দেশ। সেখানে ছিল দারিদ্র্যনিপীড়িত শিকারী, মেষপালক, ভিক্ষুকের দল। জারের আমলে এইদেশে রাজনৈতিক অপরাধীদের নির্বাসন দেওয়া হইত। সেখানে তুষারমণ্ডিত তুন্দ্রা ও নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ টাইগা অঞ্চল। খাদ্যসম্ভার না লইয়া সে-দেশে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত ছিল; কারণ সেখানে চাষাবাদের কথা কেহই জানিত না। সেখানকার অধিবাসীরা রাশিয়ার বণিক-সম্প্রদায় কর্তৃক চিরকাল অত্যাচারিত ও প্রবঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে। গোটা কয়েক সূঁচের বদলে একটা বল্‌গা হরিণ, এক বোতল ভড্‌কা মদের পরিবর্তে একটা সেবল উহারা



লেনিনগ্রাডে ভেষজবিজ্ঞান পরীক্ষাগারের একাংশ



পায়রাটির মস্তিষ্ক খুলিয়া ফেলায় বিড়াল দেখিয়াও সে ভয় পাইতেছে না। সোভিয়েট বিজ্ঞানী পাভলভের ছাত্রবৃন্দ আচরণতত্ত্বের গবেষণার জন্য এইভাবে

সানন্দে দিয়া দিত। উহাদের খাদ্য বলিতে ছিল সামান্য পচা মাছ অথবা নিকৃষ্ট দুগ্ধ। উহাদের পশুশালাই ছিল নিজেদের বাসগৃহ। রোগ ছিল উহাদের চিরসাথী—যক্ষ্মা ও অন্ধতায় বহু লোক ভুগিত। উহাদের শিক্ষা ছিল না, বর্ণমালা ছিল না।

সোভিয়েট রাষ্ট্র উহাদিগকে মানুষের মর্যাদা প্রদান করিয়াছে। কুড়ি বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলের রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। উত্তর সাগরের জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় দুর্গম দেশ সুগম হইয়াছে। খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের ফলে বন্যপ্রদেশে সমৃদ্ধ নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পের সঙ্গে গিয়াছে কৃষিব্যবস্থা। দারিদ্র্য ও দুর্দশার হইয়াছে নির্বাসন। মানুষ নবজন্ম লাভ করিয়াছে। ইয়াকুটিয়া অঞ্চলে ইয়াকুট নামে একটা সামান্য গ্রাম ছিল। এখন সেখানে এক নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার লোকসংখ্যা ২৫ হাজার। দেশের অশিক্ষা বিদূরিত হইতেছে—প্রত্যেকটি শিশু বিদ্যালয়ে যায়। একদা যাহাদের বর্ণমালা ছিল না, বিশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের ভাষায় নয়খানা সংবাদপত্র চলিতেছে। এখানকার এক লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা দুই লক্ষ।

ব্যবসায়িক-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন শাসক সম্প্রদায় পৃথিবীর অন্য যে দেশে গিয়াছে সেখানকার অবস্থার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পাভিযানের পার্থক্য তুলনীয়।

কাজাক, খীরগিজ, তুর্কমেন, জিপসী, ইভেঙ্ক প্রভৃতি জাতি যাযাবর শ্রেণীর। এই যাযাবরেরা সমগ্র রাশিয়ার তিনচতুর্থাংশ অধিকার করিয়া থাকিত। উহারা জনসংখ্যায় ১ কোটির কম ছিল না। উহারা স্ব স্ব পশুর পাল লইয়া তৃণভূমির খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইত। উহাদের গৃহ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—তাঁবু খাটাইয়া এখানে সেখানে

উহারা বাস করিত। এই গৃহহীন যাযাবরেরা দারিদ্র্য ও অনশনের ভিতর দিয়া দিন কাটাইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই জীবনধারা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া অপরিবর্তনীয় স্রোতে প্রবহমান ছিল। জারের শাসনতন্ত্র এই ভবঘুরেদের গার্হস্থ্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই।

সোভিয়েট রাশিয়ায় এই সকল যাযাবরেরা ধীরে ধীরে স্থায়ী বসবাস নির্মাণ করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ের ভিতরে এক লক্ষ যাযাবর গৃহীতে পরিণত হইয়াছে এবং কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য উহারা যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করিবার পরও নিজেদের উপজীবিকা পশুপালন ত্যাগ করে নাই। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে উহাদের পালিত পশুর জন্য তৃণসংস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

এই সকল যাযাবর জাতি জীবনে দুইবার স্নান করিত, জন্ম ও মৃত্যুকালে। কাহারও কোন অক্ষর পরিচয় ছিল না—চিকিৎসক বলিতে তাহারা ভূতপ্রেতের ওঝাকেই চিনিত। এক্ষণে যাযাবরের উপনিবেশে স্নানাগার, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে।

মরুভূমি, মেরুপ্রদেশ বা পার্বত্য অঞ্চল—সকল স্থানের যাযাবরের জন্যই উপযুক্ত গ্রাম, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পাদির কারখানা প্রতিষ্ঠা হইতেছে। গৃহহারা গৃহ পাইয়াছে, সর্বহারা পাইয়াছে সম্পদ, অজ্ঞান পাইয়াছে জ্ঞান।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের সূচনায় উজবেকীস্থান ছিল অনুন্নত প্রদেশের অন্যতম। তৈমুর ও চেঙ্গীজ খাঁর দেশ, সমরখন্দ ও বোখারা—ইতিহাসের রহস্যময় অঞ্চল। দ্রাক্ষাক্ষেত্র, অগুরু চন্দন,

দাড়িম্ব বেদানার দেশ—বোরখা-ঢাকা রহস্যময়ী রমণী—বাহ্যত বিদেশীর মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ দারিদ্র্য, উৎপীড়ন, শোষণ ও অশিক্ষা—তাহার খবর কে রাখিত? দেশের মাটি মরুভূমি, কোথায়ও বা সামান্য জলসেচন দ্বারা কেহ সামান্য চাষাবাদ করিত। জার সাম্রাজ্যের অধীনে দেশে শোষণের মাত্রা আরও বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েট য়ুনিয়নের অধীন হওয়ার পর পরের বৎসর কাল মধ্যে সেই দেশের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় জল সেচনের ও সারপ্রদানের ফলে মরুভূমিতে সোনা ফলিতেছে। উজবেকীস্থানে উৎপন্ন তুলা সমস্ত সোভিয়েটের তুলার দুই-তৃতীয়াংশ।

১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে তুলার উৎপাদন হার যথাক্রমে ১৫০%, ২০৫%, ২০৫% ও ২১২% বর্ধিত হয়।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে এখানে কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প ও কৃষি সম্প্রসারণের সঙ্গে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। উজবেকীস্থানে প্রত্যেক বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে। পঁচিশ হাজার ছাত্র উচ্চশিক্ষা পাইতেছে। উজবেকীস্থানের নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কৃষিবিজ্ঞানী, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করে। মাত্র বিশ বৎসরে কি পরিবর্তন!

ভারতবর্ষের সীমান্তে অবস্থিত তাজিকস্থানের অর্থনৈতিক তথা সর্বাঙ্গীণ প্রগতিও উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে এই দেশ সোভিয়েটের অধীনে আসে। পৃথিবীর মধ্যে এইটি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা তরুণ রাষ্ট্র এবং ততোধিক তরুণ ইহার প্রধান নগর স্টালিনাবাদ—মাত্র সেদিন ছিল কতকগুলি মাটির-ঘরে-ঘেরা গ্রাম। কিন্তু আজ সেখানে

গড়িয়া উঠিয়াছে কারখানার কোলাহল মুখরিত শহর। ভাখস নদীতে বহুসংখ্যক খাল কাটিয়া ৪১ হাজার একর জমিকে উৎকৃষ্ট জাতের তুলা জন্মাইবার উপযুক্ত করা হইয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য মনে হইবে যে, জলসেচনের জন্য এখানে যতগুলি খাল কাটা হইয়াছে পর পর জুড়িয়া দিলে সেইগুলি পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে পারে।

এই দেশে উজবেক, তুর্কী, আফগান, ইহুদী প্রভৃতি পনের ষোলটি সংখ্যালঘু জাতির বাস। আশ্চর্য এই—দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির পর ইহাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বিভেদ মন্ত্রবলে বিলীন হইয়াছে। পূর্বতন শাসন ব্যবস্থায় (আমীরের অধীন) ইহারা যত্র দ্বন্দ্বই না করিত!

এমনি বিচিত্র রূপান্তরের ইতিহাস মধ্য-এশিয়া ও সাইবেরিয়ার প্রায় সর্বত্র।

যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে লোকাভাবে গ্রামগুলি ধ্বংস হইয়াছে, নগরগুলি নরনারীর ক্রমবর্ধমান ভিড়ে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে—বর্তমান সভ্য জগতের ইহা অন্যতম চিত্র। সোভিয়েট রাশিয়ায় চিত্রটি অন্যরকম। গ্রাম উঠিয়া নগরে জনতা সৃষ্টি করে নাই—নগরই গ্রামে উঠিয়া আসিয়াছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন নগর গঠিত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে অনুন্নত ও অজ্ঞাত কত অঞ্চল সমৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মরুভূমি ও অরণ্য অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠার ফলে শহর গঠিত হইয়াছে। পুরাতন নগর শিল্প প্রসারের জন্য যত না সম্প্রসারিত হইয়াছে ততোধিক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে নূতন নগর। শতাধিক নগর নূতন করিয়া নির্মিত হইয়াছে—একদা সেখানে কিছুই ছিল না।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেও গ্রামাঞ্চলে নগরের প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

এই সকল নগরের প্রতিষ্ঠা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া শিল্প ও কৃষি-বণ্টনের বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সুবিধানুযায়ী হইয়া থাকে। ইহারই ফলে রাশিয়ায় নগর ও গ্রামের সীমারেখা প্রায় বিলীন হইতে চলিয়াছে। সাধারণ কৃষকেরা তাহাদের পূর্বতন ক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর কুটির ত্যাগ করিয়া শহরের স্বাস্থ্যকর বড় বড় খোলা বাড়ীতে বাস করিতেছে। একদা যাহারা যাযাবর ছিল এখন তাহারা সুগঠিত নগরের অধিবাসী।

তাজিকস্থানের রাজধানী স্টালিনাবাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেখানে ৫০ হাজার লোকের বাস। খিরগীজরা 'ফ্রুনজে' নামক নূতন শহরের পত্তন করিয়াছে। এখানে কলকারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, থিয়েটার প্রভৃতি রহিয়াছে। এক লক্ষ লোক এই নগরের অধিবাসী।

উত্তর ককেশাসের পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী কারাচায়েভগণ ইতিপূর্বে পাহাড়ে পাহাড়ে পশু চরাইত—বাসগৃহ ছিল পর্বতের উপর পাখীর বাসার মত কুটির। কুবান নদীর উপত্যকা অঞ্চলে ইহাদের রিপাব্লিকের রাজধানী 'মিকোয়ান-শহর' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উত্তর সাইবেরিয়ার 'ইগারকা', কোলা উপত্যকার 'কিরোভস্ক' এই প্রকার নূতন শহর। কোলা উপত্যকায় ইতিপূর্বে জনমানবের বিরল বসতি ছিল। স্যামী-ল্যাপ জাতীয় অর্ধ-যাযাবর লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিত। খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের পর এখানে রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, বেতারঘাঁটি প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। স্যামীল্যাপেরা উন্নত জীবনে অভ্যস্ত হইতেছে। শহরে ৪০ হাজার লোক বাস করে। ইহাদের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি

আছে। এই অঞ্চলে বৎসরে দেড়মাস কাল নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি, আবার দেড়মাস কাল সূর্য অস্ত যায় না। নূতন শহরে, নূতন পরিবেশে মানুষ নূতন জীবন পাইতেছে।

গৃহহীনকে নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া তাহাদের অন্ন যোগাইতেছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আনন্দ দিবার যথোচিত ব্যবস্থাও করিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রমিককে দৈনিক সাত ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। মানুষের আনন্দ ও অন্য কাজ করিবার অবসর বেশী হইয়াছে। এই অবসর বিনোদনের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থাও আছে। পুস্তকপাঠ অবসর যাপনের অন্যতম কার্য। ক্রমবর্ধমান পাঠকদের দাবী মিটাইবার জন্য ব্যাপক ভাবে পুস্তক, সংবাদপত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে। জারের আমলে (১৯১৩) রাশিয়ায় ৮৫৯ খানা সংবাদপত্র ছিল, সেগুলির প্রচার সংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশী ছিল না। সোভিয়েট য়ুনিয়নে (১৯৩৭) ৮৫২১ খানা সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ অন্ত হইবার পর দেখা গিয়াছে ঐ সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ইংলণ্ড, জার্মানী ও জাপানে প্রকাশিত পুস্তকের সমষ্টির সমান। সেখানে জনগণের সাংস্কৃতিক জীবন কতটা উন্নত হইয়াছে তাহা ঐ দেশের পুস্তকের চাহিদা লক্ষ্য করিলেই জানা যাইবে। টলস্টয়ের 'রেসারেক্‌সন' পুস্তকখানার নূতন সংস্করণের ১০০০ বই একদিনে ও পুস্কিনের গ্রন্থাবলী তিনঘণ্টায় ৬০০ খানা বিক্রী হইয়াছিল। জারের রাশিয়ায় (১৯১২) এক বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৩ কোটি ৩৬ লক্ষ—সোভিয়েট য়ুনিয়নে (১৯৩৮) এই সংখ্যা ৭০ কোটিতে দাঁড়ায়। বিশ বৎসরের (১৯১৭-৩৭) মধ্যে গোর্কীর গ্রন্থের ৩ কোটি ২০ লক্ষ, পুস্কিনের

১ কোটি ৯০ লক্ষ, টলস্টয়ের ১ কোটি ৪০ লক্ষ, সেখভের ১ কোটি ১০ লক্ষ, টুর্গেনিভের ৮০ লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়।

মস্কো 'ইণ্টারন্যাশনাল বুক হাউস' নামক প্রতিষ্ঠান ৮৫টি বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করে। যদিও রাজনৈতিক পুস্তকের বিক্রয় সংখ্যা খুবই বেশী, তবুও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকের পাঠকসংখ্যাও অন্যান্য দেশের তুলনায় বিস্ময়কর। আইনস্টাইনের গ্রন্থাদি কোন দেশেই খুব বেশী সমাদর লাভ করে না—উহার পাঠকসংখ্যা প্রায় হাতে গোনা যায়। সোভিয়েট য়ুনিয়নে ১০ বৎসরের মধ্যে (১৯২৭-৩৬) আইনস্টাইনের গ্রন্থ ৫৫ হাজার বিক্রীত হইয়াছে। বিজ্ঞানের পুস্তকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। জনগণের সমৃদ্ধির পিছনে বিজ্ঞানের কতটুকু দান রহিয়াছে তাহা বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা দ্বারাই পরিমাপ করা যায়।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের গ্রন্থাগারগুলিতে প্রতি এক শত লোকের জন্য গড়ে ৭৫ খানা বই আছে। জার্মানীতে (১৯৩৪) এই সংখ্যা ছিল ২৫।

শিক্ষাবিস্তারের স্বরূপ ও দ্রুত উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যাইবে মধ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে। উজবেকীস্থানের শতকরা দুইজন লোকও জারের আমলে শিক্ষিত ছিল না। ইহাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিপন্থী হওয়ার ভিতরেই তদানীন্তন রাষ্ট্রের স্বার্থ নিহিত ছিল। অশিক্ষা, কুসংস্কার, বর্বরতা ও বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার করাই ছিল শাসনতন্ত্রের নীতি। এখন সেখানে শতকরা ৮০ জন শিক্ষিত। এই সকল দেশে বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবার কথা উঠিতেই পারে না, কারণ শিক্ষাদান ব্যাপারে পূর্বতন রাষ্ট্রের কোন কর্তব্য ছিল না—বিশেষত মেষচারণকারী

যাযাবর জাতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ কোথায় এবং প্রয়োজনই বা কি ? সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীনে বাইলোরাশিয়ায় ২২, আজেরবাইজানে ১৩, আর্মেনিয়ায় ৮, উজবেকীস্থানে ৩০, তুর্কমানীস্থানে ৫, কাজাকস্থানে ১৯ এবং খিরগীজিয়ায় ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ইতিপূর্বেও জর্জিয়া একেবারে পিছনে ছিল না ; কিন্তু সেখানে বিপ্লবের পূর্বে ১টি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—ছাত্রসংখ্যা ছিল তিন শত। এক্ষণে জর্জিয়ার ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১৮০০ ছাত্র পাঠাভ্যাস করে।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের পরে ১৯৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দেশের শিক্ষাবিস্তারের তথ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হইতে জানা যাইবে। জারের রাজত্বকালে দুইশত বৎসরে রাশিয়ায় যতগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল সোভিয়েট শাসনাধীনে ২০ বৎসরে তদপেক্ষা বেশী সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার ছাত্র সংখ্যা

(১৯১৪ এবং ১৯৩৮)

বিদ্যালয়ের শ্রেণী	১৯১৪ (জার শাসনাধীনে)	১৯৩৮-৩৯ (সোভিয়েট য়ুনিয়নে)
সেকেণ্ডারী স্কুল	৯,৯১০০০	১২০,৭৬০০০
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	১,১২০০০	৬,০১০০০
মোট ছাত্রসংখ্যা (সকল রকম বিদ্যালয়)	৮১,৩৭০০০	৪৭৪,৪২১০০

সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্রমবর্ধমান স্বরূপ দেশের লোকের ভিতরে বুদ্ধিজীবী ও বিশেষ দক্ষতাপূর্ণ কায়িক শ্রমের উপযোগী লোকসংখ্যার বৃদ্ধি লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি হইবে। ১৯২৬-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েট য়ুনিয়নের লোকসংখ্যা শতকরা ১৬ ভাগ বর্ধিত হয়। ঐ সময়ে উপরোক্ত বুদ্ধিজীবী ও দক্ষ কারিগরের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ

বুদ্ধিজীবী—			
এঞ্জিনিয়ার	...	৭·৭	গুণ
কৃষি বিশারদ	...	৫·০	”
বিজ্ঞানী	...	৭·১	”
শিক্ষক	...	৩·২	”
চিকিৎসক	...	২·৩	”
শ্রমজীবী—			
শ্রমিক	...	৩·৭	গুণ
মেকানিক	...	৬·৮	”
টার্ণার	...	১৩·০	”
মিলকর্মী	...	৪·৪	”
ট্রাক্টর চালক	...	২১২·০	”

বিভিন্ন বিভাগের কর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি দেশের শিল্প ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পরিচায়ক।

জনস্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থা করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় বিশেষ বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান আছে। প্রায় তিনশত গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের অধীনে ৯৬০০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মী স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণায় রত আছেন। ইহাদের কার্য মানুষের দেহবিষয়ক আধুনিক

তথ্যাদি নির্ণয় ও ভেষজ-শাস্ত্রের প্রয়োগবিষয়ে পরীক্ষা করা। রোগনির্ণয়ের নবতম প্রক্রিয়া, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিষেধের নূতন ব্যবস্থা ইঁহারা আবিষ্কার করেন। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের সমন্বয়ে নূতন চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন স্বাস্থ্যতত্ত্ব অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সহযোগিতায় সোভিয়েট স্বাস্থ্যবিভাগও অসামান্য ফল প্রদর্শন করিয়াছে। জারের আমলে (১৯১৩) দেশে মৃত্যুর যে হার ছিল সোভিয়েট রাশিয়ায় (১৯৩৭) মৃত্যুর হার তদপেক্ষা ৪০% কম—শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেক হইয়াছে।

সোভিয়েট স্বাস্থ্যবিভাগের দৃষ্টি রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপরেই বেশী নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় রোগনিবারণ ও স্বাস্থ্যহানির প্রতিবিধান করাই প্রধান লক্ষ্য। এতদুদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশে দেখা যায়, শিল্পাঞ্চলে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে ও শ্রমিকের জীবনীশক্তি কমিয়া যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্র এতদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান। স্বাস্থ্যবিভাগের অনুমোদিত ব্যবস্থানুসারেই কারখানাদি নির্মিত হইয়াছে। নূতন শহর নির্মাণেও জনস্বাস্থ্য-বিভাগের পরিকল্পনানুযায়ী কার্য করিতে হয়। সোভিয়েট য়ুনিয়নে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত। শিল্পকারখানার শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বহুবিধ ব্যবস্থা হইতেছে। এতৎ-সম্পর্কে কয়লাকে মাটির নীচে গ্যাস করিবার পদ্ধতির পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়লাকে গ্যাসের আকারে তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা হওয়ায় কয়লাখনির কদর্যতা অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

কারখানার দুর্ঘটনা নিবারণ ও তাহার প্রতিকারার্থ অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

দারিদ্র্য ও নৈতিক দৈন্যের অবশ্যম্ভাবী ফল যক্ষ্মা ও যৌনরোগ পূর্বতন রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে দ্রুত ধ্বংসের পথে টানিয়া লইতেছিল। সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে এই সকল রোগের ক্রমবিস্তার কমিয়া গিয়াছে—স্বাস্থ্যবিভাগের চেষ্টায় এই রোগ নির্মূল হইতে চলিয়াছে। যক্ষ্মায় মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৮৩ ভাগ কমিয়াছে। যৌনব্যাধিও লুপ্তপ্রায়।

শিল্প-কারখানার সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ ছিল শ্রমিকের অস্বাস্থ্যকর পরিপার্শ্ব। অশিক্ষা, নৈতিক অবনতি ও ব্যাধি মানুষকে পশুর পর্যায়ে টানিয়া নামাইত। কিন্তু এযে কত বড় মিথ্যা সোভিয়েট বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র তাহা জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিতেছে। সোভিয়েট বিজ্ঞান মনুষ্যসমাজের এই চিরন্তন সমস্যার যে সমাধান করিয়াছে তাহাতে যন্ত্ররাক্ষসীর রূপ বদলাইয়াছে।

বিজ্ঞানের রুদ্রমূর্তি আজ বিশ্বমানবের ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু যে রুদ্র, সেইত শিব! শিবের আশীর্বাদে বিশ্বমানব যে কল্যাণের সন্ধান পাইয়াছে—সেই দিকে আজ আর দৃষ্টি না দিয়া উপায় নাই।

সমাপ্ত